শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা ।

পুস্তকপ্রাপ্তির ঠিকানা—

অতুল লাইব্রেরী—

৫৪।৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ও

ইসলামপুর, ঢাকা।

গুরুদাস লাইব্রেরী—

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঘুঘুডাঙ্গা, পোঃ, কলিকাতা।

কলিকাতা

২১।৩ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯

উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল রায়

দাদামহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

দাদা !

বাল্যকাল হইতেই এই এক খেয়াল লইয়া পড়িয়া আছি, কিছুদিন পূর্ব্বে আমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী বন্ধুবর্গের উৎসাহে "মঞ্জরী" প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভগবানের কৃপায় মঞ্জরীর একটু আদর হইয়াছে দেখিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। কিন্তু কাহার নিকট এই পুস্তক লইয়া প্রথম উপস্থিত হইব ! চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম,—লজ্জা-সঙ্কোচ-বিদ্বেষবর্জ্জিত স্থান আপনার শ্রীচরণব্যতীত আমার আর দ্বিতীয় নাই ; তাই এই "তন্বী" আপনারই পাদ-পদ্মে অর্পণ করিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের মুক্ত আশীর্ব্বাদে আমি ধন্য হইয়া সর্ব্বত্র জয়ী হইব। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সুরেন্দ্রকুটীর
ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা
২৬শে আশ্বিন, ১৩১৯।

আপনার চিরানুগত
স্নেহের ভাই
সুরেন্

নিবেদন

আমার এই পুস্তকের অধিকাংশ গল্প আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় দেখিয়া দিয়াছেন। মদীয় জ্যেষ্ঠপ্রতিম "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই সংগ্রহের উপযোগী গল্পগুলি পাণ্ডুলিপি হইতে বাছিয়া দিয়াছেন। আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া প্রুফ্‌ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের তত্বাবধান করিয়াছিলেন, ইঁহাদের উদার সাহায্যব্যতীত এ পুস্তক-প্রকাশ হইত কি না সন্দেহ। পরিশেষে আমি পরম গৌরব ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, দেশপূজ্য বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমি সকল বিষয়েই ইঁহাদের নিকট ঋণী।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

সূচী

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভূমিকা

আর একখানি

বঙ্গভাষায় নূতন, কল্পনায় নূতন,

কবির সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি লইয়া

শীঘ্রই

অভিনব উপাদেয়

পরিবেশনের

ব্যবস্থা হইতেছে

ভূমিকা

এই পুস্তিকা ক্ষুদ্রা, ক্ষুদ্রা বলিয়াই তন্বী। ইহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প আছে।

অনেক সময় এমন হয় যে হৃদয়ের মধ্যে একটু আধটু কেমন ফাঁক্ ফাঁক্ ঠেকে। তখন ইতিহাস, বিজ্ঞান ত ভাল লাগেই না, বড় গল্পও পড়িতে পারা যায় না। কেবল ছোট গল্প পড়িতে ভাল লাগে। হৃদয়ের সেইরূপ শূন্য পূরণের জন্যই এই পুস্তিকার প্রয়োজন।

সকল গল্পগুলিই যে সকল সময়ে ভাল লাগিবে, এমন কোন কথা নাই, তবে এমন ভরসা করা যায় যে, দুই চারিটি পড়িলে, একটি আধ্‌টা পড়িতে ভাল লাগিতে পারে।

তন্বী লেখা বেশ সরস, ও সরল পড়িবামাত্রই বুঝিতে পারা যায়, এবং অনেক সময় প্রাণে লাগে। 'স্বর্ণময় ভবিষ্যৎ' এই রূপ দুই একটি কথা ইহাতে আছে বটে, কিন্তু আমি ভরসা করি, গ্রন্থকার আপনার ভবিষ্যৎ যদি যশের রশ্মিতে উজ্জ্বল করিতে চান, তবে এ স্বর্ণের মায়া ত্যাগ করিবেন।

দুই একটি গল্পের নমুনা বলি :—প্রথম গল্প 'সৌন্দর্য্য'। সুকুমার বাল্য কাল হইতে বাহ্য সৌন্দর্য্যই বুঝিত। রূপ বুঝিত, গুণ বুঝিত না। একটি গুণবতী সুন্দরীকে বিবাহ

করিয়াছিল, কিন্তু তাহার গুণ তত বুঝে নাই। বালিকার যখন পনর বছর বয়স, তখনও সুকুমার তাহার গুণ বুঝিতে পারে নাই। সেই সময় যুবতীর দারুণ বসন্ত হইল, সে নিতান্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে স্বামীকে তাহার ঘরে আসিতে দিল না। যুবতীর কোমল হৃদয়ের কতকটা সুকুমারের মনে লাগিল। বসন্তে ষোড়শীর মুখ অতি কুৎসিত হইল। সুকুমার অনেক অর্থব্যয় করিয়া মুখের কাল দাগ উঠাইতে পারিল না, তখন নিজে নানা গ্রন্থ গবেষণা করিয়া মুখে একটা প্রলেপ লাগাইয়া দিল। মুখ একেবারে বিকৃত হইয়া গেল। সুকুমার দেখিয়া বলিল, "কমলা, আমি নিজের মূর্খতায় তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তোমার সুন্দর মুখ বিকৃত করিয়া দিয়াছি।"

মধুর কোমল কণ্ঠে অবিচলিত চিত্তে কমলা বলিল "তোমার জিনিষ তুমি নষ্ট করিয়াছ, তাহাতে দুঃখ কিসের।"

যে সৌন্দর্য্যের জন্য সুকুমার পাগল, কিন্তু যাহার সেই সৌন্দর্য্য, সে তাহা হারাইয়া কিছু মাত্র বিচলিত হইল না।

সুকুমারের চক্ষের সম্মুখে একটা নূতন আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সেই দীপ্ত আলোকে দিব্য চক্ষে দেখিল—সেই কমলার বিকৃত ত্বকের নীচে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, কি স্বর্গরাজ্য।

তৃতীয় গল্প বিধবা। শিশির, আধুনিক কেতাবী কায়দা মত শুভার সহিত বাল্য কাল হইতে খেলা ধূলা করিয়াছে, একটু বড় হইয়াও করিয়াছে। কিন্তু শুভার অন্যত্র বিবাহ

হইল, এবং সে বিবাহের বৎসরে বিধবা হইল। ইহার এক বৎসর পরে শুভার পিতা শিশিরের কাছে বিধবা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, বলিলেন "এবিষয় তোমার মাতারও মত আছে। শিশির বিবেচনার জন্য সময় লইল—তাহার পর ভাবিতে লাগিল (৩৪ পৃষ্ঠার শেষ প্যারা) সে স্থির করিল, দেবী দেবীই থাকিবে। শিশির শুভাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিল।

আমাদের হিন্দুর এইরূপ সুনীতি ও সদাচারের কথায় পরিপূরিত ছোট গল্পগুলি সময়ে সময়ে বড়ই ভাল লাগে।

আমিত আমার কথা বলিলাম—পাঠক একবার দেখুন না কেমন লাগে।

২৯শে ভাদ্র, ১৩১৯
কদমতলা, চুঁচড়া। } শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

তন্বী

বাল্যকাল হইতেই সুকুমার কিছু অতিরিক্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয়। বয়সের সঙ্গে তাহার এ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। অর্থের কোন অভাব ছিল না। ধনবানের সন্তান, কার্য্যক্ষেত্রেও তাহার কোন বাধা উপস্থিত হইল না।

কবি যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমুগ্ধ, সৃষ্ট বস্তুমাত্রই তাহার সৌন্দর্য্যের আধার, সকলের মধ্যেই একটা নিহিত সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়—তাহারই পূজা করে; সুকুমারের তাদৃশ

অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার কিছু অতিরিক্ত লক্ষ্য দেখা যাইত।

সে সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। তাহার পুস্তকাধার হইতে মস্যাধার পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ঝক্‌ঝকে। সুন্দর বাটী, সুরুচিসম্পন্ন উদ্যান। বাগানে একটি শুষ্ক পত্র পড়িতে দেখা যাইত না। প্রতি সপ্তাহে তাঁহার বৈঠকখানার ছবিগুলি পরিবর্ত্তিত হইত। চাকরেরা কেহ ময়লা পরিচ্ছদ পরিতে পাইত না। ধব্‌ধবে জামা, নিত্যই রজকালয় দর্শন করিত। আমরা তাঁহাকে সৌন্দর্য্য-প্রিয় বলিলেও সাধারণে তাঁহাকে অতিরিক্ত বিলাসী বা বাবু আখ্যা দিয়াছিল।

সুকুমারের পিতা ছিলেন না, মাতা বর্ত্তমান। পুত্রের যৌবন আসিল, বিবাহের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, সুকুমারের কিন্তু পাত্রী পছন্দ হয় না। দুই বৎসর চেষ্টা করিয়াও মাতা পুত্রের মনোমত পাত্রীর সন্ধান করিতে পারিলেন না।

মাতার অনুরোধে সুকুমার তাঁহাকে কালীঘাটে দেবী-দর্শনে লইয়া গিয়াছে। মন্দিরের চারিদ্দিকে আবর্জ্জনা, লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে। আজন্ম রজকগৃহ-বঞ্চিত বিচিত্র বর্ণের সাড়ী-পরিহিতা মাড়োয়ারী মহিলারা সুকুমারের গা ঘেসিয়া ঘেসিয়া চলিয়া যাইতেছে। মলিন চির-পরিহিত ভিখারীর দল

ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ধরিতেছে! সদ্যোজলধৌত গাঁদার মালা ও সিন্দূর লইয়া ব্রাহ্মণেরা জোর করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিতে আসিতেছে। সুকুমার বড় বিরক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল।

ভূমিষ্ঠ হইয়া সুকুমারের মাতা গদগদচিত্তে কালীমাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন, "মা আমার সন্তানকে সুমতি দাও, তাহাকে সংসারী কর"। তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছিল। ঠিক সেই সময়েই অঙ্গনের জলে পা পিছ্‌লাইয়া কে যেন সশব্দে পড়িয়া গেল।

চমকিত হইয়া সুকুমার সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। সে আর চোক্ ফিরাইতে পারিল না, দেখিল—একটি বালিকা পড়িয়া গিয়াছে। কি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী পুষ্পমঞ্জরীসদৃশা অতুলনীয়া সুন্দরী! সুকুমার মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। সুকুমারের মাতাও চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার দৃষ্টি রূপমুগ্ধ পুত্রের প্রতিও পড়িল। মনে মনে ভাবিলেন, এ সুন্দরী বালিকাটী কি তাঁহার স্বজাতীয়া? বাঞ্ছাময়ী মাতা তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ কি করিবেন?

বালিকার বিধবা মাতা সস্নেহে কন্যাকে ধরিয়া তুলিলেন। সুকুমারের মাতা এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না, অগ্রসর হইয়া বালিকার হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন,—

"আহা কোথায় লেগেছে মা!"

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিধবার সহিত সুকুমারের মাতার পরিচয় হইয়া গেল। বিধবা তাঁহার স্বজাতি। কৌশলে তাঁহাদের বাসস্থানের ঠিকানা জানিয়া লইয়া মাতাপুত্রে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

বিধির নির্ব্বন্ধ ইহাকেই বলে। সেই বালিকার সহিতই সুকুমারের বিবাহ হইয়া গেল। কমলা গরিবের মেয়ে, গৃহস্থালী করা চির-অভ্যাস। বিপুল ধনশালীর গৃহে আসিয়া কর্ম্মহীন জীবন লইয়া বসিয়া থাকায়, সে বড় অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। পায়ে একটু ধূলা লাগিলে, পাণ খাইতে হাতে চূণের দাগ লাগিলে, সুকুমার বড়ই বিরক্ত হয়। মুহুর্ম্মুহু পরিচ্ছদ্ পরিবর্ত্তন, পটটির মত নিশ্চল হইয়া সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকা, অনভ্যস্ত বালিকার পক্ষে বড়ই বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল; কিন্তু বালিকা স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত।

সে তাহার স্বামীর অনিচ্ছায় একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করিত না। বালিকার ইচ্ছা, সে তাহার স্বামীর জন্য পাণ সাজে, আসন পাতিয়া জলখাবার গুছাইয়া দেয়, তাহার জামা কাপড় জুতা ঝাড়িয়া রাখে, স্বামীর শয্যাটি আপন হাতে পাতে। তাহার মনের সাধ মনেই থাকিয়া যায়, স্বামীর ভয়ে কিছুই করিতে পারে না।

সুকুমার পত্নীর চুলের সজ্জিত গুচ্ছটির একটি কেশ

স্থানান্তরিত হইলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে! বালিকার বুক শুকাইয়া যায়।

এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল, এখন কমলা পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী।

সে বৎসর কলিকাতায় বসন্তের বড়ই প্রাদুর্ভাব। যাঁহাদের পল্লিগ্রামে বাসস্থান আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগের পরিবারবর্গকে সেইখানে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। সহরময় একটা আতঙ্ক ও উদ্বেগ! সুকুমারও সহর ছাড়িয়া কোথাও যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। এমন সময় একদিন সন্ধ্যার সময় কমলার ভয়ানক জ্বর হইল।

আশঙ্কায় সকলের মুখই শুখাইয়া গেল। ডাক্তার আসিলেন, তিনিও দুই তিন দিন না গেলে কি হইবে বলা যায় না, বলিয়া গেলেন। তিন দিন পরে কমলার দেহে বসন্ত দেখা দিল। কি নিদারুণ অসহনীয় যন্ত্রণা! সর্ব্বাঙ্গে বিস্ফোটক! কমলা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

সুকুমার পত্নীকে দেখিতে আসিল। ব্যস্ত হইয়া কমলা বলিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, এ ঘর থেকে যাও।" সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন, কেমন আছ?" কমলা উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আমি বেশ আছি, তুমি এখন এ ঘর থেকে যাও।"

সুকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন, এখনও বিষ সংক্রামক হয় নাই।"

কমলা বলিল, "না হয়েছে নেই হয়েছে, তুমি ঘর থেকে যাবে কি না বল ?"

স্বল্পভাষী কমলা আজ মুখরা। সুকুমার নিষেধ শুনিল না, নিকটে আসিতে লাগিল, কমলা অস্থির হইয়া পড়িল। অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমার এ কথাটা রাখ, কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছ! তুমি এখান থেকে যাও, এ ঘরে থেক না"।

নিজের যন্ত্রণা ভুলিয়া পাছে সুকুমার সংক্রামক-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, সে জন্য বালিকার কত ভয়, কত উদ্বেগ! সুকুমার আজ একটা নূতন সুখ—নূতন আনন্দ মনে মনে অনুভব করিল। পত্নীপ্রেম-প্রতিভাতচিত্ত সুকুমার ব্যথিত হইয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

পরিদৃশ্যমান বস্তু কিছুই চিরস্থায়ী নহে, রূপও সেইরূপ। কমলা সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার অপ্সরোবিনিন্দিত রূপরাশি মলিন ও বিকৃত হইয়া গেল। রূপপ্রিয় সুকুমার অনেক চেষ্টা—অনেক অর্থব্যয় করিল, কিন্তু বসন্তের দাগ কমলার মুখ হইতে গেল না। সুকুমার এ জন্য সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ।

স্বামীর চিত্তের অপ্রসাদ*পত্নীরও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সুকুমার অপ্রতিহতগতি বিধিবাদের বিরুদ্ধে সাহসী বীরের মত তাহা রোধ করিতে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু মানুষের নিষ্ফল-চেষ্টা কিছুই করিতে পারিল না, কমলার মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ রহিয়াই গেল। সুকুমার কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

যখন বহু চিকিৎসায় সে দাগ গেল না, সে তখন নিজেই নানা দেশ হইতে লুপ্ত সৌন্দর্য্য উদ্ধারবিষয়ক মূল্যবান্ পুস্তকাদি আনাইয়া এই দাগ যাহাতে নষ্ট হয়, তাহার উপাদানসংগ্রহের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিল।

আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি,—সুকুমার দিনকতক মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, কিন্তু ডিসেক্‌সন্ রুমের বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া তাহার আর ডাক্তারি পড়িবার প্রবৃত্তি রহিল না। সে বাড়ীতেই পুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করিত।

বাহ্য সৌন্দর্য্যপ্রিয় সুকুমার হতশ্রী কমলাকে কেন যে গৃহে স্থান দিয়াছিল, কেন যে দারুণ অধ্যবসায়ের সহিত তাহার পূর্ব্বশ্রী ফিরাইবার জন্য অপ্রতিহতভাবে চেষ্টা করিতেছিল, সে নিজেই তাহা ভাল বুঝিতে পারিত না। কমলাও এই আকস্মিক রূপপরিবর্ত্তনে স্বামীর অপ্রীতির কারণ হইয়াছে ভাবিয়া দিন দিন মলিন হইতে লাগিল।

তন্বী

দুই বৎসরের পরিশ্রমের পর সুকুমার একটি ঔষধ স্থির করিল। ঔষধের প্রলেপ দিয়া বার ঘণ্টা ক্ষতস্থান বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর আর ক্ষতচিহ্ন থাকিবে না, ত্বক্ সম্পূর্ণ মস্তণ ও চিক্কণ হইয়া যাইবে।

সযত্নে সুকুমার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিল। তাহার স্থির বিশ্বাস, এই ঔষধে তাহার উদ্দেশ্য নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে। সন্ধ্যার সময় দৃঢ়চিত্ত যুবক পত্নীর মুখে ঔষধের প্রলেপ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দিল। কমলাও মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর! আমার স্বামীর অভীষ্ট যেন সিদ্ধ হয়, তাঁহার চিত্তের উদ্বেগ দূর হয়।" সুকুমারের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, সে রাত্রিতে উঠিয়া উঠিয়া ঘড়ী দেখিতে লাগিল।

প্রভাতের কাক ডাকিয়া উঠিল। উদ্বেলিতচিত্ত সুকুমার জালানা খুলিয়া দিল, তখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই, সুকুমার উৎকণ্ঠিত ভাবে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। উৎকণ্ঠায় কমলারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। ঈষৎ অরুণ রেখা গগনপ্রান্তে দেখা দিল। কম্পিত হস্তে সুকুমার পত্নীর মুখের ব্যাণ্ডেজ খুলিতে লাগিল। কমলার আবরণহীন মুখ দেখিয়া সুকুমার চীৎকার করিয়া ভীত ভাবে দুই তিন হাত সরিয়া দাঁড়াইল।

সৌন্দর্য্য

হায়! কমলার ঈষৎ-বসন্ত-ক্ষত সুন্দর মুখ বিকৃত বীভৎস হইয়া গিয়াছে! জানালা দিয়া প্রভাতের শীতল বায়ু আসিতেছিল। সুকুমারের মস্তকে নরকাগ্নি জ্বলিতেছিল। আশাভঙ্গ অনুতপ্ত যুবক কাতর কণ্ঠে বলিল, "কমলা! আমি নিজের মূর্খতায় তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তোমার সুন্দর মুখ বিকৃত করিয়া দিয়াছি।"

মধুর কোমল কণ্ঠে অবিচলিত চিত্তে কমলা বলিল, "তোমার জিনিষ তুমি নষ্ট করিয়াছ, তাহাতে দুঃখ কিসের!" যে সৌন্দর্য্যের জন্য সুকুমার পাগল, কিন্তু যাহার সেই সৌন্দর্য্য সে তাহা হারাইয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইল না!

সুকুমারের চক্ষের সম্মুখে একটা নূতন আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সে দীপ্ত আলোকে দিব্য চক্ষে দেখিল—সেই কমলার বিকৃত ত্বকের নীচে কি অপূর্ব্ব স্বর্গরাজ্য, কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! জগতে তাহা অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্য সুকুমার জীবনে দেখে নাই। জগতের সৌন্দর্য্য পুরাতন হয়, মলিন হয়; কিন্তু ইহা যে চির-আবিলতাশূন্য অনন্ত সৌন্দর্য্য! সুকুমার বিস্মিত নেত্রে কমলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। ওদিকে পৃথিবীর অন্ধকার নাশ করিয়া গগনবক্ষে অরুণ হাসিয়া উঠিল।

স্মৃতির মূল্য

বিপত্নীক বৃদ্ধ হেক্‌টর অতি সদাশয় ও উদারপ্রকৃতির লোক বলিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার পত্নীপ্রিয়তার কথা যুবতীসমাজে উপমাস্বরূপ ছিল। আজ বিশ বৎসর হইল হেক্‌টরের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। হেক্‌টর উচ্চ কর্ম্ম করিতেন। অনেক শ্বেতমর্ম্মরলাঞ্ছিত সুন্দরী হংসগ্রীবা উন্নত করিয়া লোলুপদৃষ্টিতে তাঁহাকে পতিত্বে বরণের বাঞ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু হেক্‌টর সে ফাঁদে পা দিলেন না। একমাত্র পুত্র ক্লিওফোর্ডকে লইয়া নীরবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

তিন বৎসরের ক্লিওফোর্ডকে রাখিয়া প্রিয়তমা পত্নী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। পত্নীর স্বর্ণবর্ণের রেশমবিনিন্দিত কোমল কেশরাশি তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর বড় গর্ব্বের বিষয় ছিল। বৃদ্ধের পত্নীর কেশের প্রশংসা সুন্দরীসমাজে প্রায়ই ধ্বনিত হইতে শুনা যাইত, মূল্যবান্ পরচুলাও তাহার সমকক্ষ হইত না। সান্ধ্য ভ্রমণের সময় তাঁহার পত্নীর কেশগুচ্ছ

মৃদু বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া যখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইত, তখন ভ্রমণশীল যুবক যুবতীরা অনিমিষলোচনে মুগ্ধ হইয়া সে শোভা দর্শন করিত। হেক্‌টর সর্ব্বজনমুগ্ধকারী সুকেশিনী পত্নীর পতি মনে করিয়া মনে মনে একটা বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতেন। পত্নীর মৃত্যু হইলে হেক্‌টর তাহার কেশরাশি একটি মূল্যবান্ রৌপ্যাধারে অতি যত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। প্রতিদিনই অবসর মত নির্জ্জনে তাহা দেখিয়া পত্নী-প্রেমবিহ্বল বৃদ্ধের দুই চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইত, জাগ্রত স্বপ্নের মত—বিগত জীবনের সুখস্মৃতি তাঁহার চক্ষুর উপর কল্যকার ঘটনার মত নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিত। বৃদ্ধের জীবনের সুখশান্তি, আনন্দ-উল্লাস এই কেশগুচ্ছের প্রতি কোটিতে বিজড়িত ছিল। বিশ বৎসরের সযত্নরক্ষিত এই স্বর্গস্মৃতি তিনি আপনার জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান্ মনে করিতেন।

(২)

বৃদ্ধ নিজের উপার্জ্জনের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া পুত্রকে যথাসম্ভব উচ্চভাবে প্রতিপালন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইল বটে, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার স্নেহপ্রাচুর্য্যে অতিরিক্ত বিলাসী হইয়া পড়িল। ক্লিওফোর্ড বাল্যকাল হইতেই তাহার অবস্থার অতিরিক্ত চালে

প্রতিপালিত হইয়াছিল, সে সাধারণ লোকের সহিত বড় একটা মিশিত না, ধনিসন্তানদিগের সহিতই তাহার অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং তাহাদের বাহিরের চাল চলন অনুকরণ করিত। অধিকাংশ ধনিসন্তানেরা উচ্চশিক্ষিত হইলেও আভিজাত্যের গর্ব্বে কেমন একটা অভিমানের ভাব সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করে। তাহারা পয়সাকে পয়সা বিবেচনা করে না, নিষ্প্রয়োজনীয় এমন অনেক ব্যয় করে, যাহা তাহাদের পক্ষে তত মারাত্মক না হইলেও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে প্রাণান্তকর ব্যাপার। ক্লিওফোর্ডের পিতার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর, নিজের উপার্জ্জনের সামর্থ্য নাই, চেষ্টাও নাই, অথচ ব্যয় বড় মানুষের ছেলের মত।

পিতা পুত্রের মনোক্ষোভের ভয়ে কোন কথাই বলিতেন না। উপযুক্ত বর্ষাব্যতীত ধরণী শস্যশালিনী হন না, আবার অতিরিক্ত বর্ষাই শস্যের হানি করে। পিতা-মাতার স্নেহ না পাইলে সন্তান সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল ও কঠোর-প্রকৃতি হইয়া পড়ে, আবার সেই স্নেহ অতিরিক্ত হইলেই সন্তানের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হয়। হেক্টরের অতিরিক্ত স্নেহই ক্লিওফোর্ডকে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অপব্যয়ী করিয়া তুলিল।

ক্লিওফোর্ড সঙ্গীদিগের সহিত পার্টি নৌবিহার প্রভৃতিতে যোগদান করিত; নাচের মজলিসে কথায় কথায় বাজি রাখিত,

পরাজিত হইয়া ধনিসন্তানদিগের মত দুঃখিত না হইয়া বরং উৎসাহ প্রকাশ করিত। বাজি হারিয়া দুঃখপ্রকাশ ভদ্রতা-গর্হিত, ক্লিওফোর্ডের এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। মহিলা-সমাজেও তাহার এজন্য একটা খুব উচ্চ সুখ্যাতি ছিল। সে প্রায়ই ভোজের টেবিলে ভোজনান্তে মহিলাদিগের সহিত বাজি রাখিয়া তাস খেলিত, হারিয়াও এত আমোদ প্রকাশ করিতে ক্লিওফোর্ডের মত কেহই পারিত না। তাহার নিমন্ত্রণের অভাব ছিল না এবং নিয়মিত সময়ে প্রতিনিয়ত ঘড়ীর কাঁটার মত উপস্থিত হইবার শক্তিও তাহার মত আর কাহারও দেখা যাইত না। ধারে তাহার কুণ্ঠা ছিল না, ধার দিবার লোকেরও অভাব হইত না। কারণ, যাহারা জুয়াখেলে, তাহারা তাহাদের সঙ্গীদিগকে যতটা বিশ্বাস করে, সাধারণ সমাজে সেরূপ বিশ্বাস দুর্ল্লভ।

টাকার পর টাকা দিয়া বৃদ্ধ হেক্টর যতই নিঃস্ব হইয়া পড়িতে লাগিলেন; পুত্রের খেলিবার বাতিক ততই অধিক মাত্রায় বাড়িতে লাগিল। টাকা চাহিয়া না পাইলেই ক্লিওফোর্ড বৃদ্ধকে নানারূপ বাক্যে মর্ম্মপীড়া দিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিত। পুত্রবৎসল হেক্টর পুত্রের বিষণ্ণ বদন দেখিতে পারিতেন না, যেমন করিয়া হউক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া পুত্রের মনস্তুষ্টি করিতেন। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা হইয়া

পড়িল যে, পুত্রের উৎপীড়নে ঘড়ী ও চেনটি পর্য্যন্ত পোদ্দারের দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(৩)

ক্লিওফোর্ড সকল সময়ে পিতার নিকট টাকা পাইত না, সে জন্য তাহাকে অনেক সময় বাজারে ঋণ করিতে হইত। বৃদ্ধ হেক্‌টরের সত্যপ্রিয়তায় অনেকের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার পুত্রকে ঋণ দিতে কেহ বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিত না। ক্লিওফোর্ড সামান্য চেষ্টাতেই বাজারের টাকা পাইতে লাগিল। একবার ঋণের হাত হইলে মানুষ আর জীবনে অঋণী হইতে পারে না। পিতা যে কত কষ্টে পুত্রের ঋণ পরিশোধ করিতেন, পুত্র একবারও তাহা ভাবিয়া দেখিত না। ক্লিওফোর্ডের ঋণের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছিল। ঋণ করিবার সময় পরিশোধ করিবার কথা তাহার মনে উঠিত না, অসঙ্কুচিত চিত্তে ঋণ করিয়া অবাধে খরচ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। বৃদ্ধ ইদানীং সব ঋণ শোধ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? এক ঋণ শোধ হইতে না হইতেই পুত্র দশ-জায়গায় ঋণ করিয়া বসিত।

হেক্‌টর ব্যতিব্যস্ত হইয়া একদিন পুত্রকে ডাকিয়া বলি-লেন,—"বাবা, তুমি ত আমার অবস্থা দেখিতেছ, আমার উপার্জ্জনের সমস্ত ব্যয় করিয়াও তোমাকে স্বচ্ছন্দে রাখিবার

চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, সঞ্চয় কিছুই করিতে পারি নাই। তোমার এরূপ উচ্ছৃঙ্খল ব্যয় এখন আমার শক্তির অতিরিক্ত হইয়া পড়িতেছে।”

পুত্র গম্ভীর ভাবে বলিল—“ভদ্রসমাজে মিশিতে গেলে ব্যয়সঙ্কোচ চলে না। তুমি আমাকে ছোট লোকের মত প্রতিপালন করিলেই পারিতে, তাহা হইলে তোমাকে এত ব্যয় করিতে হইত না।”

ক্ষুব্ধ হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন—“তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ, এখন উপার্জ্জনক্ষম, উপার্জ্জন কর, তাহা হইলে কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে না।”

পুত্র উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল,—“উমেদার হইয়া দরজায় দরজায় ঘোরা আমার দ্বারা হইবে না।”

বৃদ্ধ নিরাশ হইয়া বলিলেন,—“তবে এক কাজ কর। আমার মাসিক উপার্জ্জনের সমস্ত টাকা তুমি নিজে হাতে লইয়া খরচ কর, সাংসারিক ব্যয় করিয়া যাহা বাঁচিবে তাহা তুমি নিজের জন্য খরচ করিও; আমার আপত্তি নাই। নতুবা তোমার এ অতিরিক্ত ব্যয় কেমন করিয়া চলিবে।”

বৃদ্ধ উপার্জ্জনের সমস্ত টাকা পুত্রের হস্তে দিলেন। সে মাসে রুটিওয়ালা পর্য্যন্ত একটি পয়সা পাইল না; বৃদ্ধ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ক্লিওফোর্ডের ব্যয় যেমন

চলিতেছিল, তেমনিভাবে চলিতে লাগিল। পুত্রের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় বৃদ্ধের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই নষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। এদিকে পাওনাদারেরা টাকা না পাইয়া অনেক তাগাদার পর ক্লিওফোর্ডের নামে আদালতের আশ্রয়গ্রহণ করিল। ওয়ারেণ্টের ভয়ে ক্লিওফোর্ড আসিয়া পিতার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধ সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলেন না, পুত্রকে অনেক মিষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। ক্লিওফোর্ড প্রতিজ্ঞা করিল, কোনরূপে এ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলে সে আর কখনও ঋণ করিবে না। হেক্‌টর গৃহের আসবাবপত্র ও শেষ সম্বল পৈতৃক সম্পত্তিটুকু বিক্রয় করিয়া পুত্রের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন।

(৪)

জুয়ার বাতিক যায় না। কে এক জন বড়লোক বলিতেন, "যে বাল্যকালেও একবার জুয়া খেলিয়াছে, তাহাকে আমি জীবনে কখনও বিশ্বাস করি না।" ক্লিওফোর্ড দিনকতক খুব সাবধানে চলিল, সে বড় একটা কাহারও সহিত মিশিত না।

মিস্ করোলাইন নাম্নী এক সুন্দরী যুবতীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছিল। তাহার অনুরোধে পড়িয়া ক্লিওফোর্ডকে একটি নাচসভায় যোগ দিতে হইল। নাচের মজলিসে জুয়া-খেলা একটা প্রথা; ইহা প্রায় কেহই দূষণীয় মনে করে

না। অনুরোধে পড়িয়া ক্লিওফোর্ডকেও খেলিতে হইল। নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে স্রোত আরও প্রবল বেগে বহিতে থাকে, ক্লিওফোর্ডেরও তাহাই ঘটিল। একদিন একটা বড় মজলিসে একটী সুন্দরী যুবতীর সহিত খেলা আরম্ভ হইল। যুবতী সম্ভ্রান্তবংশীয়া,—তাহাতে সুন্দরী। ক্লিওফোর্ডের হারের পর হার হইতে লাগিল, কিন্তু সে মোহিনী মায়া ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না। অভ্যাসদোষ বড় দোষ! সে তাহার নিজের অবস্থা ভুলিয়া গেল। সেই দিনই সে সুন্দরীর নিকট দুই হাজার পাউণ্ড ঋণী হইল।

ক্লিওফোর্ড কপর্দ্দকশূন্য। ঋণের টাকা না দেওয়া, বিশেষতঃ সুন্দরী রমণীর ঋণ শোধ না করা অতি কাপুরুষের কর্ম্ম। সুন্দরীরা নোট পুড়াইয়া চা খাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বাজির টাকার একটি ফার্দ্দিংও ছাড়িতে পারেন না। ক্লিওফোর্ড কি করিবে, লজ্জার খাতিরে বাজারের কোন মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া সুন্দরীর ঋণ পরিশোধ করিল, কিন্তু সে বিশেষ ভাবে জানিত, তাহার ঋণ পরিশোধের উপায় নাই। ভবিষ্যৎ-চিন্তায় সে বড় কাতর হইয়া পড়িল। দাবার চাল দিয়া পরাজিত খেলোয়ারের মত চালের দোষের আক্ষেপ যেমন কোনই কাজে আসে না, অন্তরের পীড়া বৃদ্ধি করে মাত্র, ক্লিওফোর্ডেরও সেই দশা উপস্থিত হইল। সে

নিজের অবিমৃষ্যকারিতাকে শত সহস্র ধিক্‌কার দিল। দুশ্চিন্তায় তাহার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না।

(৫)

বাজারের মহাজনেরা ইদানীং তাহাদের আর্থিক অবস্থা অনেকটা অবগত ছিল। মহাজন তাগাদার উপর তাগাদা করিয়া অবশেষে বৃদ্ধ হেক্‌টরকে এ কথা জানাইল। ক্ষুব্ধ বৃদ্ধ কাতর ভাবে স্পষ্ট বলিল, এ টাকা পরিশোধ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই; তবে কিছু বেশী সময় দিলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে। মহাজন সে কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। আদালতে টাকার ডিক্রি হইয়া ক্লিওফোর্ডের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল।

বৃদ্ধ একদিন আফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় ক্লিওফোর্ড ছুটিয়া আসিয়া ব্যাকুল ভাবে হেক্‌টরকে বলিল, "বাবা, আমায় বাঁচাও।"

বৃদ্ধ কাতর ভাবে পুত্রের দিকে চাহিলেন। ক্লিওফোর্ড বলিল, "বাবা, আমার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে, নীচে পেয়াদারা অপেক্ষা করিতেছে। এখনি দু হাজার পাউণ্ড না দিলে আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে লইয়া যাইবে।"

বৃদ্ধ ভীত চকিত ম্লান দৃষ্টিতে পুত্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

"তুমি ত আমার সব অবস্থাই জান।"

ব্যাকুল ভাবে ক্লিওফোর্ড বলিল,—

"এইবার বাঁচাও, আর আমি এমন কাজ করিব না।"

পুত্র জানু পাতিয়া পিতার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। স্নেহার্দ্র বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে পুত্রের হাত দুটি ধরিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন,—

"আমি কি করিব বলিয়া দাও, তাহাই করিতেছি। আমার যে আর কোনও উপায় নাই।"

ক্লিওফোর্ড বলিল,—"বাবা তুমি ইচ্ছা করিলেই পার।"

উৎসুক নেত্রে পুত্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"কি উপায় আছে বল? আমি এখনি করিতেছি।"

ক্লিওফোর্ডের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল,—

"মায়ের চুলের বাক্স আর চুলগুলি বেচিলেই আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইতে পারি।"

ক্লিওফোর্ডের কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তড়িৎবেগে বৃদ্ধের সমস্ত ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ পড়িয়া যাইতেছিলেন, চেয়ার অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি রক্তশূন্য মুখে পুত্রের প্রতি উদাস দৃষ্টিপাত করিলেন। স্তম্ভিত ভীত ক্লিওফোর্ড শুষ্ক কণ্ঠে বলিল "বাবা—"। উত্তেজিত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিল, "না না, তাহা আমি পারিব না।"

বৃদ্ধ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। সিঁড়িতে শব্দ হইতে

লাগিল, পেয়াদারা উপরে আসিতেছে। ত্রস্তভাবে ক্লিওফোর্ড পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, সে মুখ মৃতের মত, চক্ষু স্থির নিষ্কম্প। পেয়াদারা আসিয়া ওয়ারেণ্ট দেখাইল, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ক্লিওফোর্ড চুম্বন করিয়া মস্তকে ধারণ করিল। সে একবার ভীতিব্যাকুল নিরাশদৃষ্টিতে পিতার প্রতি চাহিয়া দেখিল—বৃদ্ধ বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। পুত্রবৎসল পিতার এই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিতে অনুতপ্ত যুবকের প্রবৃত্তি হইল না। সে কোন কথা না বলিয়া পেয়াদাদের সহিত চলিয়া গেল।

স্তম্ভিত হতবুদ্ধি মর্ম্মপীড়িত বৃদ্ধ ব্যাকুল ভাবে একবার ক্লিওফোর্ডকে ডাকিল, কিন্তু তাঁহার সে আহ্বান কম্পিত ওষ্ঠে মিলাইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই ক্লিওফোর্ডের বিবাহপণবদ্ধা কুমারী কেরোলাইন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। বৃদ্ধ তখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া। কুমারী কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, নীরবে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধ একবার আকুল কণ্ঠে ডাকিলেন, “ক্লিওফোর্ড!” কেহই উত্তর দিল না। বৃদ্ধ উন্মত্তের মত সমস্ত ঘরে কি যেন অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যথা-

সময়ে পাচিকা আহার দিয়া গেল, বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্যও করিলেন না। এই ভাবে সমস্ত দিন গেল, রাত্রিতেও তাঁহার নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত্রি ছাদে পায়চারী করিতে লাগিলেন। আলমারী খুলিয়া যত্ন-রক্ষিত রৌপ্যপেটিকা হইতে চুলগুলি বাহির করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়াচাড়া করিলেন, কিন্তু মনের তৃপ্তি হইল না; একটা দারুণ শূন্যতা তাহার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। মস্তিষ্কে অগ্নি জ্বলিতেছিল! বৃদ্ধ ছুটিয়া বাহিরের শীতল বাতাসে আসিলেন, কিন্তু শীতল হইতে পারিলেন না। ব্যাকুল ভাবে কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "ক্লিওফোর্ড"।

নৈশগগন প্রতিধ্বনি করিল, "ক্লিওফোর্ড"।

সে শূন্য আর্ত্তস্বরে বৃদ্ধ অন্তরে আরও শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন অল্প অল্প অন্ধকার আছে, জগৎ নিস্তব্ধ। সেই দারুণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রভাতের শীতল বাতাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা করুণ ক্রন্দনের রোল উঠিতেছিল। বৃদ্ধ কাণ পাতিয়া শুনিলেন—কে যেন অতি ব্যাকুলস্বরে ডাকিতেছে, "হ্যারি"। বৃদ্ধের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার শূন্য বুক যেন করুণ রোলে ভরিয়া গেল। বৃদ্ধ স্থির থাকিতে পারিলেন না। কান্নার স্বর অনুসরণ করিয়া ছুটিলেন। পাশের বাড়ী হইতেই কান্নার সুর আসিতেছিল। বৃদ্ধ কম্পিত পদে দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন, "ম্যাডাম ম্যাথি"।

ভিতর হইতে রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল, "কে মিষ্টার হেক্‌টর।"

হেক্‌টর—হাঁ।

ম্যাথি—ভিতরে আসুন।

হেক্‌টর সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আপনি কাঁদিতেছিলেন কেন ম্যাডাম?"

ম্যাথি বলিলেন, "আমার হতভাগ্য পুত্রের জন্য।"

সমবেদনাকাতর স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধের হৃদয় পুত্রবৎসলা বৃদ্ধার কাতরতায় রুদ্ধ পুত্রস্নেহে প্লাবিত করিয়া দিল। তিনি ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "কেন ম্যাডাম?"

"আমার পুত্র যে জাহাজে কার্য্য করে; তাহার নিয়মভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, তাহাকে দুই শত পাউণ্ড জরিমানা দিতে হইবে, নতুবা তাহার দুই শত বেত হইবে। হায় দুর্ভাগিণী বিধবা আমি অত টাকা কোথায় পাইব! নিদারুণ বেত্রাঘাতে আমার পুত্রের প্রাণান্ত হইবে।"

মাতৃহৃদয়ের করুণ বিলাপে বৃদ্ধের চক্ষুর সম্মুখে পুত্র ক্লিওফোর্ডের বিষাদক্লিষ্ট নিরাশ মুখখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে বৃদ্ধার বন্দী পুত্রের মলিন মুখখানিও তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধার হৃদয়ের বেদনার সহিত হেক্‌টরের হৃদয়-বেদনা মিলিত হইয়া, দুইটী হৃদয় এক সুরে বাজিয়া উঠিল।

কোন কথা না বলিয়া হেক্‌টর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে আলমারী হইতে পত্নীর স্মৃতি চুলের বাক্‌সটি বাহির করিয়া লইয়া একজন বেশকারীর দোকানে গিয়া বলিলেন,—

"এইটি রাখিয়া আমাকে দুইশত পাউণ্ড দিতে পার?"

বেশকারী চুলটি দেখিয়া বুঝিল, বহু মূল্যের চুল, সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। সে দ্বিতীয় কথা না বলিয়া দুই শত পাউণ্ড বৃদ্ধের হস্তে দিল।

বৃদ্ধ টাকা লইয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহার চির-আদরের প্রাণাধিক প্রিয় স্মৃতির বাক্‌সটির প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না। টাকা কয়েকটি আনিয়া ম্যাডাম ম্যাথির হস্তে দিলেন। বিস্মিত হইয়া ম্যাডাম হেক্‌টরের মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি স্বর্গীয়-মাতৃস্নেহব্যঞ্জক, পবিত্র কৃতজ্ঞতাপূর্ণ, সেই দৃষ্টিতে হেক্‌টরের হৃদয়ের শূন্যতা যেন মুহূর্ত্তে পূর্ণ হইয়া গেল। প্রিয় পুত্র বিসর্জ্জন দিয়াও যে প্রিয় স্মৃতি এতদিন তিনি অতি যত্নে রজতপেটিকায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ এক মুহূর্ত্তে হেক্‌টর তাহার যথার্থ মূল্য বুঝিলেন!

বিধবা

বাঁড়ুযোদের মেয়ে সুভা শিশিরদের জালানার সম্মুখের পেয়ারাতলায় বসিয়া অপক্ক পেয়ারা চর্ব্বণ করিতে করিতে যখন চঞ্চল দৃষ্টিতে গৃহের ভিতর দৃষ্টিপাত করিতেছিল, তখন শিশিরের বাপ শিশিরকে য়্যালজাব্রার নীরস অংশ সরস করিয়া গিলাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন; শিশিরের তাহা নিতান্ত তিক্ত ও শুষ্ক বলিয়া বোধ হইতেছিল। সে কিছুতেই গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছিল না।

পিতা রাগিয়া য়্যালজাব্রাখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,

"তুই নিতান্ত গাধা, তোর কিচ্ছু হবে না।"

অন্য সময়ে এই গর্দ্দভ আখ্যা শিশির নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিয়া অতি সহজেই পরিপাক করিতে পারিত, কিন্তু সুভার সম্মুখে সে অমন একটা নির্ব্বোধ পশুর সহিত উপমেয় হইতে নিতান্ত নারাজ ছিল। সে গভীর অভিমানে ছল ছল নেত্রে পিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

পিতা পুত্রের অভিমানাহত মুখখানি দেখিলেন, তাঁহারও হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি সস্নেহে বলিলেন,

একটু মন দিয়ে প'ড়লে আর কতক্ষণ লাগে! তুই যে না বুঝিস্ তাও নয়; যা এখন খেলা ক'রগে যা, রাত্রে পড়িস্ এখন।"

পিতা চলিয়া গেলেন। শিশিরও বাহিরে আসিয়া লাফাইয়া পেয়ারা গাছে উঠিল। সুভাকে কতকগুলি পেয়ারা পাড়িয়া দিল ও কতকগুলি কাঁচা পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে সুভার সহিত গঙ্গার ঘাটে গেল।

লালরংএর ঢেউয়ে সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। নীচে গঙ্গা তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। ছোট ছোট তরঙ্গ ভাই বোনের মত গলাগলি করিয়া লুটাপুটি খাইতেছে।

শিশির সুভাকে বলিল, "আয় না গা ধুই।"

সুভা। বেলা গেছে, মা বক্‌বে।

শিশির। তবে তুই ব'সে ব'সে দেখ, আমি সাঁতার কাটি।

শিশির তীরে কাপড় রাখিয়া গঙ্গার জলে লাফাইয়া পড়িল। বিচিত্র ভাবে নানা কৌশল দেখাইয়া, ঢেউয়ের উপর গা ভাসাইয়া সাঁতার কাটিতে লাগিল। সুভা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না; মায়ের গালাগালির কথা ভুলিয়া গিয়া সেও গঙ্গার জলে লাফাইয়া পড়িল।

দু'জনে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিতে লাগিল। সুভার চুলের বন্ধন খুলিয়া গিয়া, মুক্তকেশরাশি ঢেউয়ের তালে নাচিয়া

নাচিয়া ভাসিতে ছিল। গন্ধতেলের মৃদু সুবাস জলের ঢেউয়ে ভাসিয়া আসিয়া শিশিরের মুখে চোখে পড়িতে লাগিল।

সুভাদের বাড়ীর ঝি তরীর মাসী ঘাটে জল আনিতে আসিয়া দেখে দুই জনে অবেলায় সাঁতার কাটিতেছে।

সে ত্রস্তভাবে বলিল, "দিদিবাবু ক'রছ কি, ওঠো। অবেলায় অমন ক'রে সাঁতার কাট্‌লে অসুখ ক'রবে যে।"

সে কথা শোনে কে! খিল খিল করিয়া হাসিয়া সুভা আরও গভীর জলে যাইতে লাগিল।

তরীর মাসী ঈষৎ উগ্রস্বরে বলিল,—"দেখ, তুমি কথা শুন্‌ছ না, শীগ্‌গীর উঠ্‌বে ত ওঠ, নইলে আমি মাকে গিয়ে বলিগে— শিশিরের সঙ্গে অবেলায় সাঁতার কাট্‌ছে।

এবার সুভা একটু ভীত হইয়া বলিল, "লক্ষ্মী মাসীমাকে গিয়ে বলিস্‌নি, তুই দাঁড়া, আমি একটু চিৎসাঁতার কেটেই উঠ্‌ছি।"

সুভার একটু আর শেষ হয় না। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসে; কলসী কাঁকে লইয়া আর কতক্ষণ দাঁড়ান যায়!

ঝি বলিল, "এই বুঝি তোমার একটু! যা জান কর, আমি চল্‌লুম।" বলিয়া তরীর মাসী যাইতে-লাগিল।

"দাঁড়া মাসী যাচ্ছি, দাঁড়া মাসী যাচ্ছি" বলিতে বলিতে বালিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড়খানি লইয়া তরীর মাসীর

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল ; শিশিরও তাহার অনুগমন করিল।

(২)

সুভার পিতা অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ক্ষুদ্র জমিদার। যথেষ্ট আবাদী জমি খাসে চাষ হয় : এক পাল গোরু, আম বাগান, লিচু বাগান, বড় বড় পুষ্করিণী, অগণ্তি মাছ। পাঁচ সাতটি গোলায় ধান বোঝাই। তেজারতি দাদনের কারবার আছে, বাড়ীতে লোকজনের সর্ব্বদা গতায়াত, সংসার লক্ষ্মীশ্রী-পূর্ণ। তাঁহার সন্তানের মধ্যে ঐ এক মাত্র কন্যা সুভাষিণী, বড় আদরের।

শিশিরের পিতা রামকমল চক্রবর্ত্তী সাধারণ গৃহস্থলোক। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিতেন, এখন সামান্য কিছু পেন্সন পান, তাহাতেই একরূপ কষ্টেস্‌ষ্টে দিনপাত হয়। তাঁহারও একমাত্র পুত্র শিশির ; তিনি নিজ হস্তেই তাহার শিক্ষার ভার লইয়াছেন। সে গ্রামের এণ্ট্রান্স-স্কুলে পড়ে।

সুভার বয়স সাত বৎসর ও শিশিরের বয়স বার তের বৎসর হইবে। দুই জনে বড় ভাব, দুই জনে দুই জনের খেলার সঙ্গী। সুভা শিশিরের অনেক অত্যাচার সহ্য করে, কখনও সে শিশিরের উপর রাগ করে না। দুই জনের ঝগড়া বিবাদ দুই জনের মধ্যে আপোষ হয়, তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন

হয় না। দুই জনের বাল্যজীবন পরমসুখে কাটিতেছিল। কঠোর বিধি নির্জ্জনে, অলক্ষ্যে যে ভবিতব্যতা সৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই।

সুভা আট বৎসরে পড়িয়াছে। তাহার বিবাহের জন্য তাহার বৃদ্ধা দিদিমা নিতান্ত জেদ ধরিয়াছেন, তিনি জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, সুভার বিবাহ দিয়া অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের ফললাভ হাত ছাড়া করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলেন।

কাজেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে সুভার বিবাহ স্থির হইল। সেই বৈশাখেই বিবাহ। সুভা হাসিতে হাসিতে আসিয়া শিশিরকে তাহার বিবাহের সংবাদ দিল।

শিশির দুঃখিত হইয়া বলিল, "বিয়ে হলেই তুমি শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবে, আর আমাদের দেখা হবে না।"

সুভা বলিল, "তা বই কি, মা বলেছে আমি এইখানেই থাক্‌ব।"

শিশির বলিল, "পাগল আর কি! তারা শুন্‌বে কেন; তোমাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবে।"

সুভা মুখ ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাচ্ছিল্যভাবে বলিল, "ইস্! অমনি ধ'রে নিয়ে যায় আর কি! শ্বশুরবাড়ীর লোক এলেই আমি ঘোষেদের আমবাগানে গিয়ে পালিয়ে থাক্‌বো।"

সুভা তখনও বালিকা। শিশিরের অল্প অল্প জ্ঞান হইয়াছে, সে সুভার বিবাহ-সংবাদে বড়ই চঞ্চল ও বিষণ্ণ হইল।

খুব সমারোহে সুভার বিবাহ। হলুদ-মাখা সুভা একবার লুকাইয়া আসিয়া শিশিরকে তাহার শ্বশুরবাড়ী গিয়া দেখা করিতে অনুরোধ করিল। সে শুনিয়াছিল, অষ্টাহ তাহাকে সেখানে থাকিতে হইবে। সুভার হাতে একটা ছোট টিনের বাক্স ছিল, তাহাতে তাহার সযত্ন-সংগৃহীত নানা বর্ণের ছিটের টুক্‌রা, শেফালিকা ফুলের রংকরা পুতুলের কাপড়, কএক ছড়া নিজের হাতে গাঁথা পুঁথির মালা, কতকগুলি গোলাপফুলের শুষ্ক পাপ্‌ড়ি,—খুটিনাটি এমনই অনেকগুলি জিনিস তাহাতে ছিল। সুভা এই অপূর্ব্ব মূল্যবান্ দ্রব্যপূর্ণ বাক্সটি কাহারও নিকট রাখিয়া বিশ্বাস পাইত না; আজ শিশিরকে সে তাহা দান করিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া নহবতের সানাই হাওয়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিতেছিল। পিতা, মাতা, দিদিমা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহিত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সুভা পাল্কীতে উঠিল। চারিদিকে একবার সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া দেখিল, কাহাকে যেন না দেখিয়া তাহার যাইতে মন সরিতেছিল না। কিন্তু সে যাহাকে দেখিতে চায়, এত লোকের মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইল না। একটা গভীর শূন্যতায় যেন তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া গেল।

যাইতে যাইতে সুভা পাল্কির ফাঁক দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। বেহারাদিগের শ্রমনাশজনিত করুণ-স্বর তাহার হৃদয়ের করুণায় মিশিয়া থাকিয়া থাকিয়া বুক যেন ভাঙ্গিয়া দিতেছিল।

এদিকে শিশির তাহার বাড়ীর জানালা দিয়া দেখিল, সুভার পাল্কী চলিয়া গেল। অতিরিক্ত বাষ্প জমিয়া জমিয়া যেমন সশব্দে বয়লার ফাটাইয়া ফেলে, তেমনি সে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হতাশভাবে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। সে প্রবল আগ্রহে সুভার প্রদত্ত বাক্সটি বুকের ভিতর আঁকড়াইয়া ধরিল; তখনও বিবাহবাড়ীর সানাই আকুলিব্যাকুলিভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণস্বরে বাজিতেছিল।

শ্বশুরবাড়ী গিয়া সুভা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন অপরেশ বাবু কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

সুভা কাঁদিয়া পিতার হাত দুটি ধরিয়া বলিল, "বাবা আমায় বাড়ী নিয়ে চল, আমার বড্ড মন কেমন ক'চ্ছে।"

পিতা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে নানারূপে কন্যাকে বুঝাইতে লাগিলেন। সুভা পিতার নিকট শিশিরকে তাহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া দিল।

অপরেশ বাবু বাড়ী আসিয়া শিশিরকে সুভার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। শিশির সাক্ষাৎ করিতে গেল, কিন্তু লজ্জায় সুভার শ্বশুরবাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিল না; নীরবে যাইয়া নীরবে ফিরিয়া আসিল।

সুভা, শিশির "এই আসে এই আসে করিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জালানায় বসিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

(৩)

সুভার বিবাহ পাঁচ বৎসর হইয়া গিয়াছে। শিশির এখন কলিকাতায় বি, এ পড়ে। তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সংসারে একমাত্র মাতা।

গ্রীষ্মের বন্ধে শিশির বাড়ী আসিয়াছে, একদিন ভোর বেলায় সুভাদের বাড়ী হইতে একটা গভীর ক্রন্দনের রোল উঠিল, শিশিরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার হৃদ্‌পিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সুভাদের বাড়ীতে সংবাদ জানিতে গেল।

যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার সমস্ত অঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া, শিথিল ও অবশ করিয়া দিল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, পড়িয়া যাইতে যাইতে রকের উপরে হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। হায়! হিন্দুরমণীর নারীজন্মের সর্ব্বসুখ পতিরত্ন হইতে সুভা চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছে।

তন্বী

সুভা শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে। শিশির সাক্ষাৎ করিতে গেল। শিশিরস্নাত শেফালিকার ন্যায় শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিতা নির্ম্মল-দেবী মূর্ত্তির মত সুভা অন্দরের উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। স্তবকে স্তবকে সাদা মেঘমণ্ডিত আকাশ একটা বিরাট্ গাম্ভীর্য্য লইয়া ধরণীর প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিতে অটলভাবে চাহিয়াছিল। সুভার কুঞ্চিত কেশরাশি বায়ু আন্দোলিত হইয়া ঈষৎ দুলিতেছিল। শিশির আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, দুজনের কোন কথা হইল না। শিশির নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। স্নিগ্ধ সরসদৃষ্টিতে সুভা শিশিরের প্রতি চাহিয়া রহিল।

এক বৎসর হইয়া গিয়াছে, শিশির বি, এ পাশ করিয়াছে। একদিন অপরেশ বাবু শিশিরকে ডাকিয়া লইয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেলেন। নির্জ্জনে একটি ঘাটে বসিয়া অপরেশ বাবু শিশিরকে বলিলেন,—

"আজ তোমাকে একটী গুরুতর কথা বলিব, মনোযোগ দিয়া শোন। সুভা ভিন্ন আমার এ সংসারে কেহ নাই, তাহাকে সুখী দেখিলেই আমরা সুখী। অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়াছে, আমি সুভার আবার বিবাহ দিতে চাই। তুমি সুভার বাল্যকালের সঙ্গী, তোমরা উভয়ে উভয়কে ভালবাস। আমার ইচ্ছা সুভাকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করি। তোমার মাতা ভিন্ন সংসারে বিশেষ কোন আত্মীয় নাই। এ অবস্থায় তুমি সামাজিক বন্ধন

হইতে অনেকটা মুক্ত। তোমার মত হইলে কলিকাতায় লইয়া গিয়া তোমাদের বিবাহ দিব। তোমরা মাতাপুত্রে সেই খানে বাস করিবে। আমি যৌতুক স্বরূপ আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি ও কলিকাতায় একখানি বাড়ী কিনিয়া দিব। মৃত্যুর পর আমার সমস্ত বিষয় তোমরা পাইবে।"

স্থিরভাবে রুদ্ধ-নিশ্বাসে শিশির অপরেশ বাবুর কথাগুলি শুনিতেছিল।

অপরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার অভিমত কি বল।"

কম্পিত কণ্ঠে শিশির বলিল, "আমি বিবেচনা করিয়া বলিব।"

উভয়ে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

(৪)

সমস্ত রাত্রি শিশিরের নিদ্রা হইল না, সে অপরেশ বাবুর কথাগুলি চিন্তা করিতে লাগিল। বড় ভয়ানক প্রলোভন; যাহাকে ভালবাসি, যাহার চিন্তায় সুখ, ধ্যানে সুখ, কল্পনায় সুখ; সে আমার হইবে, তাহাকে নিজের করিয়া পাইব, ইহা অপেক্ষা আর কি আশা মানুষে করিতে পারে?

সমাজের ভয় নাই, একমাত্র বৃদ্ধমাতা, তাঁহারও বিশেষ কোন আপত্তি নাই; পুত্রবৎসলা মাতা পুত্রের সুখেই সুখী।

সেই মুখখানি যাহা ভাবিতে শিশির আত্মহারা হয়, সেই হাসি, সেই সলজ্জ চক্ষু, কোমল লাবণ্যময়ী তন্বী ভিতরে বাহিরে তাহার হইবে। তাহাতে তাহার আবিলতাশূন্য, নির্ম্মলস্নিগ্ধ, শীতল, প্রেমে তাহার তপ্তনিরাশক্ষুব্ধ-চিত্ত শীতল হইবে। শিশির চিন্তায় আত্মহারা হইল. মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মনে পড়িল, সেই প্রাঙ্গণে শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিতা, শান্ত-জ্যোতির্ম্ময়ী, রূপসী জীবন্ত দেবীর মত দাঁড়াইয়াছিল। আকাশ অটল, অবিচলিতচিত্তে তৃষিত দৃষ্টিতে ধরণীর প্রতি চাহিয়াছিল, কত যুগযুগান্তরের প্রেম, তৃষিত চিত্তের নিত্য তাড়না—তথাপি স্থির, ধীর. অচঞ্চল।

অলঙ্কারবিহীন যুগলহস্তের কি অপূর্ব্ব শোভা, কি অপূর্ব্ব পবিত্রতা, কি গৌরবমণ্ডিত মুখমণ্ডল ; মহিমময়ী স্বর্গীয় পুণ্য দীপ্তিপূর্ণ জাগ্রত দেবীমূর্ত্তি, আপনার মহিমায় আপনি অটল উন্নত। সেই উচ্চ পবিত্র বেদীস্থিত দেবীকে নিয়ে নামাইয়া অলঙ্কারভূষিতা সাধারণ রমণীর মত সুখ দুঃখের সঙ্গিনী করিবে! যে আজ পাঁচ বৎসর তাহাকে দেবীত্বে বরণ করিয়া অশ্রু-জলসিক্ত ভক্তি-অর্ঘ্য তাহার চরণোদ্দেশে নীরবে অর্পণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাকে কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে সর্ব্বজনপূজ্যা হিন্দুর আরাধ্যা বিধবার পবিত্র গৌরব আদর্শ হইতে নিম্নস্তরে নামাইয়া, সাধারণের চক্ষে হেয় করিবে। শিশিরের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল।

সে স্থির করিল দেবী দেবীই থাকিবে। দীন ভক্তের প্রাণের সঞ্চিত প্রেম নিত্য নির্জ্জনে তাহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইবে; তাহাই সুখ, তাহাই আনন্দ। শিশির সুভাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইল।

অপরেশ বাবু শিশিরের উত্তর পাইয়া দুঃখিত হইলেন। গোপনে অন্য পাত্র সন্ধান করিতে লাগিলেন। সুভা শুনিয়া মাকে বলিল, "বাবাকে নিষেধ কর; যেমন আছি বেশ আছি, তোমাদের চরণসেবা করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিব।"

সে দিন কি একটা যোগ। সুভা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল; শিশিরও স্নান করিতে গিয়াছে। সুভা স্নান করিতে আসিয়াছে শিশির তাহা জানিত না।

প্রভাতের বাতাসে ছোট ছোট ঢেউগুলি নাচিয়া নাচিয়া গঙ্গায় ছুটাছুটি করিতেছিল। শিশিরের সেই বাল্যের সুভার সহিত সাঁতারের কথা মনে পড়িতে লাগিল; গঙ্গা তেমনই আছে, তেমনই কাল কাল ছোট ছোট ঢেউ, তেমনই শীতল নির্ম্মল জল, তেমনই সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত রক্তরেখা নাচিয়া নাচিয়া জলের উপর ভাসিতেছিল; তেমনই ঘাটের ধারে অশ্বত্থ গাছে পাখীরা মিলিতকণ্ঠে একটা করুণ কোমল সুর তুলিয়া আনন্দে থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কার দিতেছিল।

প্রকৃতি তেমনই নবীনা, তেমনই মুখরা, তেমনই আনন্দ-

ময়ী। শিশির আপনাকে ভুলিয়া গেল; ছয় বৎসর পূর্ব্বের প্রভাত আজ যেন তাহার চক্ষের উপর খেলা করিতে লাগিল, সে বাল্যের উৎসাহে গঙ্গার জলে লাফাইয়া পড়িল।

মেয়েদের ঘাটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল, সুভা স্নান করিতেছে। কি অপূর্ব্ব শোভা! কৃষ্ণজলে কমলটির মত সুভা শোভা পাইতেছিল। নিবিড়কৃষ্ণ অলকাগুচ্ছ গঙ্গা তরঙ্গে তালে তালে নাচিতেছিল, শিশির যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল, সেই প্রভাত, সেই সুভা, সেই গঙ্গা; শিশির বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

ঠিক সেই সময়েই সুভার গাত্রধৌত একটি তরঙ্গ নাচিতে নাচিতে শিশিরের গায়ে আসিয়া লাগিল। কি শীতল কোমল-স্পর্শ! কি গভীর উন্মাদনাপূর্ণ মাদকতা, তাহার সমস্ত অঙ্গ শিথিল করিয়া দিল।

স্পর্শজনিত সুখাবেশকল্পনায় শিশিরের মাথার ভিতর ঘুরিয়া সে পড়িয়া যাইবার মত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই একটা ষ্টিমারের ঢেউ আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। শিশিরকে আর দেখা গেল না!

নূতন আদর্শ

বিজয়কোটে আজ ভারি উৎসব। সজ্জিত নাট্যশালার মত নগর আজ বিচিত্র ধ্বজপতাকা-পুষ্পমাল্যে সুশোভিত। রাজা চিত্রপ্রদর্শনী দেখিতে যাইবেন। বিস্তৃত মাঠ ঘিরিয়া এই প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়াছে। নানা দেশের চিত্রকরগণের সুন্দর সুন্দর চিত্র এই চিত্রশালায় প্রদর্শিত হইয়াছে। দলে দলে লোক সেই সকল অপূর্ব্ব চিত্র স্তম্ভিত ও বিস্মিত নেত্রে দেখিতেছে।

রাজা বাসুদেব নিজেও একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর, চিত্রশিল্পে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ। শিল্পী তাঁহার অতিপ্রিয়। তিনি নানাপ্রকারে তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন। রাজার উৎসাহে,— রাজার সাহায্যে, তখন দেশময় চিত্রশিল্পের প্রচার ও চর্চ্চা চলিতেছিল।

রাজা প্রদর্শনী দেখিতে আসিলেন। নানাভাবের নানা চিত্র। রাজা খুব মনোযোগের সহিত চিত্রগুলি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি চিত্রের কোন নূতন আদর্শ দেখিতে পাইলেন না। সেই পুরাতন একই ভাবের চিত্র বিষয়ভেদে

চিত্রিত হইয়াছে মাত্র। যথাযোগ্য সকলে পুরস্কৃত হইল। রাজা ঘোষণা করিলেন, যিনি চিত্রের নূতন আদর্শ দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাকে লক্ষ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

রাজাদেশ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল। উৎসাহে চিত্রকরেরা নূতন আদর্শের কল্পনায় উন্মাদ হইয়া উঠিল।

(২)

নগরপ্রান্তে একটি প্রকাণ্ড জীর্ণ পুরাতন বাটীর দ্বারে এক যুবতী দাঁড়াইয়াছিল। দূর হইতে একটি যুবক সেই দিকে আসিতেছিল। যুবক ঈষৎ দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট, বড় বড় চক্ষু, দৃষ্টি কোমলমধুর—অন্তরের নিহিত একটা প্রবল শক্তি যেন তাহার চক্ষুতে দিবারাত্র খেলা করিতেছে।

যুবক নিকটে আসিতেই যুবতী তাহার হাত দুটি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রদর্শনীর ছবি কেমন দেখ্‌লে ?"

যুবক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "একখানিও প্রকৃত চিত্র দেখিলাম না, কেবল নিষ্ফল বর্ণ-বৈচিত্র্য মাত্র।"

যুবতী বলিল, "তোমার ছবি দিলে না কেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পুরস্কৃত হইতে।"

যুবক। তুমি ত জান আমি পুরস্কারপ্রার্থী নই। আমি প্রাণে যে সৌন্দর্য্যের আভাস দেখিতে পাই, তাহাই চিত্রতুলিকায় পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করি। লোকের মুখ

চাহিয়া আমি কখন ছবি আঁকি নাই। লোকের প্রশংসা বা নিন্দায় আমার কিছু আসে যায় না। আমি যদি আমার হৃদয়ের কল্পনার ছবিটি সজীব ভাবে চিত্রিত করিতে পারি, তাহাতেই আমার আনন্দ, তাহাতেই আমার তৃপ্তি।

যুবতী। লোকের প্রশংসাভাজন হইতে পারিলে তোমার এ দারিদ্র্য অচিরেই দূর হয়।

যুবক। অভাব অনুভবের নামই দুঃখ, আমি কোন অভাব অনুভব করি না, কাজেই আমি এ দরিদ্রতায় দুঃখিত নই, আমার এ দরিদ্রতার মধ্যে একটা গৌরব আছে, একটা আনন্দ আছে, একটা তৃপ্তি আছে, তাই আমি এ দরিদ্রতা ভালবাসি। নগরের কোন্ ধনশালী আমার মত এমন শান্তিতে বাস করে? কোন উদ্বেগ কোন দুশ্চিন্তা আমার নাই। অবসর সময়ে আসিয়া তোমার হাসিমুখ দেখি, এ মর্ত্ত্যে আমার স্বর্গ কল্পনা হয়; তাই আমি আড়ম্বরবিহীন কুটিলতাবর্জ্জিত এই দরিদ্রতার স্পর্দ্ধা করি। তুমি কি আমার এ গৌরবে গৌরবিণী হইতে চাও না?"

যুবতী লজ্জিত হইয়া বলিল, "না, আমি সে জন্য বলি নাই। দশের নিকট তুমি সম্মান পাও, দশের মুখে তোমার প্রশংসা ধ্বনিত হউক, তোমার গৌরবে আমিও গৌরবিণী হইব।"

যুবক যুবতীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,

"অবশ্যই সে দিন আসিবে, আমি জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হইব।"

যুবতী। আমারও দৃঢ়বিশ্বাস তুমি তাহাই হইবে।

(৩)

যুবকের নাম পুরুষোত্তম, যুবতীর নাম প্রতিভা। প্রতিভার পিতা একজন সুপ্রসিদ্ধ কুসীদজীবী, অত্যন্ত কৃপণ। তাঁহার কবলে একবার পড়িলে কাহারও নিস্তার নাই। পৈতৃক বিষয় বিভব তাঁহার জীবনে পঞ্চাশ গুণের অধিক হইয়াছে। তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর, দেহ অতি শীর্ণ, কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষু, অন্তর্ভেদী তীব্র কুটিল দৃষ্টি।

আহারের পূর্ব্বে বৃদ্ধের নাম কেহ মুখে আনে না। যাত্রাকালে সম্মুখে পড়িলে লোকে দুর্গানাম স্মরণ করে, প্রভাতে কেহ তাঁহার মুখ দেখে না। কিন্তু তাহাতে বৃদ্ধের দৃক্‌পাত নাই। তাঁহার চিত্ত সমাজিক লোকের নিন্দাপ্রশংসায় কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। লোকের দুঃখে তাঁহার দুঃখ হয় না। অটল অবিচলিত চিত্তে সুদের খাতা পত্রে পাই ক্রান্তিটি পর্য্যন্ত বাদ দেন না। বাড়ীটী তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি; কিন্তু তাঁহার অধিকারে আসা পর্য্যন্ত একটি বারও রাজমিস্ত্রির হস্তস্পর্শ হয় নাই। বৃদ্ধ বহুদিন বিপত্নীক। তাঁহার একমাত্র কন্যা

প্রতিভাই এই নীরস জীবনে সাহারার মরুমধ্যস্থিত খর্জ্জুর-বৃক্ষচ্ছায়াস্নিগ্ধ সুশীতল বাপিকা।

পুরুষোত্তম বৃদ্ধের প্রতিবেশীপুত্র স্বজাতি। বাল্যকালেই পিতৃহীন হইয়াছিল। প্রতিভা তাহার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী। দুই জনে ভারি ভাব; এই ভাব যৌবনে প্রণয়ে পরিণত হইল।

দূর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের প্রভূত বিষয় পুরুষোত্তমের পাইবার সম্ভাবনা ছিল; সেই জন্য বৃদ্ধ তাহাকে একটু বেশী আদর যত্ন করিত এবং প্রতিভার সহিত বিবাহ দিবারও ইচ্ছা ছিল। পুরুষোত্তম একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে চলিত, বৃদ্ধ তাহা পছন্দ করিত না, প্রায়ই তাহাকে ব্যয়সঙ্কোচের উপদেশ দিত। পুরুষোত্তম নীরবে শুনিত, কোন উত্তর করিত না।

হঠাৎ পুরুষোত্তমের সম্পত্তি প্রাপ্তির আশা নষ্ট হইয়া গেল। বৃদ্ধ এ সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু পুরুষোত্তম কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। বৃদ্ধ অন্যত্র কন্যার বিবাহ দিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ প্রতিভা বা পুরুষোত্তম কেহ জানিত না।

(৪)

প্রতিভা একদিন সন্ধ্যার দীপটি জ্বালিয়া প্রাঙ্গণের সিঁড়ির

উপর দাঁড়াইয়াছিল। দীপের রক্তাভ জ্যোতিঃ যুবতীর গণ্ডে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেছিল। মৌন শান্ত সন্ধ্যার পার্শ্বে শেফালিকা গাছটি পরিপূর্ণ পুষ্পে নক্ষত্রপুঞ্জের মত শোভা পাইতেছিল। যুবতীর সুবঙ্কিম দেহের ছায়াটি সোপানস্তরে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যার মন্দ হাওয়ায় অঞ্চলখানি থাকিয়া থাকিয়া ঈষৎ দুলিতেছিল। পুরুষোত্তম প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহা দেখিতেছিল।

সাগ্রহে পুরুষোত্তম বলিল, "তুমি অমনি ক'রে একটু দাঁড়াও, আমি তোমার একখানি ছবি আঁকি।"

শুনিয়া প্রতিভা হাসিয়া উঠিল! দীপালোকও যেন সঙ্গে সঙ্গে হাসিল।

সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ যুবক অতি নিপুণতার সহিত একটি বর্ত্তিকা জ্বালিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল; এমন সময় বৃদ্ধ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে দেখিয়া লজ্জিতা প্রতিভার দীপটি হাত হইতে পড়িয়া গেল। চমকিত হইয়া পুরুষোত্তম চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে প্রতিভার পিতা দণ্ডায়মান। তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু অন্ধকারে মার্জ্জারের মত জ্বলিতেছে।

গম্ভীর ভাবে বৃদ্ধ বলিল, "পুরুষোত্তম, তুমি আর এখানে আসিও না, প্রতিভা এখন বয়স্থা; এরূপ ঘন ঘন আসা যাওয়া করিলে কলঙ্ক রটিবে।"

বৃদ্ধের মুখে আজ এরূপ নূতন কথা শুনিয়া তাহারা উভয়েই স্তম্ভিত হইল। পুরুষোত্তম বিনীতভাবে বলিল, "আমাদের বিবাহ শীঘ্র সম্পন্ন হইলেই সে আশঙ্কা দূর হইতে পারে।"

বৃদ্ধ বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "বিবাহ করা বিশেষ কিছু কঠিন নয়, পত্নীকে খাওয়াইবে কি?"

পুরুষোত্তম বৃদ্ধের নিকট এরূপ উত্তর আশা করে নাই। সে বলিল—"আমার যাহা জুটিবে তাহাই খাওয়াইব।"

বৃদ্ধ বলিল—"আগে জুটুক, তারপর বিবাহ করিও, আমার প্রতিভা দরিদ্রের হস্তে সমর্পিত হইবে না।"

পুরুষোত্তম বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি এ কিরূপ আদেশ করিতেছেন?"

বৃদ্ধ দৃঢ় ও কঠোর স্বরে বলিলেন, "আমি ঠিক বলিতেছি, যদি লক্ষ টাকা আমার কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ দিতে পার, প্রতিভার বিবাহপ্রার্থী হইয়া আসিও, নতুবা এই শেষ।"

বৃদ্ধ কন্যার হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন। হতবুদ্ধি পুরুষোত্তম প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চিত্রতুলিকাহস্তে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

(৫)

সংসার কল্পনায় গড়া নয়, কার্য্যক্ষেত্রে কল্পনায় কাজ হয় না। যে পুরুষোত্তম অর্থের কোন প্রয়োজন বোধ করে নাই, স্বল্প

আয়েই তুষ্ট ছিল, আপনার কল্পনারাজ্য লইয়াই তন্ময় থাকিত, আজ সে কাতর ব্যথিতচিত্তে সমস্ত রজনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। আজ বুঝিল সংসারে অর্থের প্রয়োজন। আজ অর্থের জন্য সে প্রতিভালাভে বঞ্চিত হইতেছে।

নীল আকাশে উজ্জ্বল তারকা, চন্দ্রজ্যোতিঃপ্রতিভাত স্বচ্ছ-তরঙ্গিণী, জ্যোৎস্নায় অস্ফুটদৃষ্ট বিটপীশ্রেণী, কিছুই তাহার মনে শান্তি দিতে পারিল না। সে পাগলের মত সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ; কিন্তু তাহার মন শান্ত হইল না। প্রভাতে অস্ফুট আলোক, অন্ধকার-মিশ্রিত বর্ণ-বৈচিত্র্যময়ী ধরণী, নিশির শিশিরস্নাত পুষ্পরাশি, কলসীকক্ষে নিদ্রাবিজড়িত কৃষ্ণচক্ষু কৃষকবধূর লজ্জাবিচঞ্চল নয়নভঙ্গী, গোবৎসের চঞ্চল উল্লম্ফন কিছুতেই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। প্রতিভা-বিহীন সংসারকে সে অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল।

পুরুষোত্তম চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিল—নিষ্ফল চেষ্টা! তাহার কল্পনাপূর্ণ চিত্তকক্ষের দ্বার প্রতিভা যেন রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে আজ বুঝিল, প্রতিভাই তাহার চিত্র, প্রতিভাই তাহার কল্পনা, প্রতিভাই তাহার জীবনের পূর্ণতা।

এদিকে প্রতিভা পিতার তাড়নায় দিন দিন মলিন হইয়া পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না, তিনি এক

অশীতিবর্ষ ধনী বৃদ্ধের সহিত কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ একদিন নিশীথে স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার বৃদ্ধ জামাতার মৃত্যু হইয়াছে; তাহার সঞ্চিত রাশি রাশি স্বর্ণ মোহর নিজের সিন্দুকে সযত্নে তুলিতেছেন; শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিতা বিধবা কন্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ আনন্দে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া কন্যার ম্লান মুখখানি দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "মা, এ সবই তোমার"।

প্রতিভা যেন বলিল, "না বাবা, আমার টাকার প্রয়োজন নাই, সবই তুমি নাও।"

হঠাৎ কন্যার কণ্ঠস্বরে বৃদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলেন, প্রতিভা ম্লান দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। কন্যার মুখের দিকে চাহিতে বৃদ্ধের কেমন একটা লজ্জা করিতে লাগিল।

হাত মুখ ধুইয়া বৃদ্ধ বাহিরে আসিয়াই সম্মুখে দেখিতে পাইলেন পুরুষোত্তম দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধের মনে তখনও স্বপ্নের টাকার কথা আন্দোলিত হইতেছিল। পুরুষোত্তমকে দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল, বুঝি ভোরের স্বপ্ন সত্য হইবে। পুরুষোত্তম টাকা লইয়া আসিয়াছে। তাঁহার কোটরগত চক্ষু পরিপূর্ণ লালসায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ পুরুষোত্তমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "টাকা এনেছ বুঝি? কই দাও"। বৃদ্ধ সাগ্রহে শীর্ণ হস্তখানি বাড়াইয়া দিলেন। অর্থলোলুপ বৃদ্ধের মনোভাব হস্তখানির শিরায় শিরায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

এই অপূর্ব্ব হস্তভঙ্গি দেখিবামাত্রই পুরুষোত্তমের মস্তকে একটা নূতন কল্পনা জাগিয়া উঠিল। পুরুষোত্তম দৃঢ়ভাবে বলিল, "মহাশয়, কল্যই আমি আপনাকে লক্ষ টাকা দিব।"

সে প্রতিভার নিমিত্ত বৃদ্ধকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু আর সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, চলিয়া গেল।

(৬)

রাজা দরবারে বসিয়াছেন। নানাস্থান হইতে চিত্রকরেরা চিত্র দেখাইতে আসিয়াছে, কিন্তু রাজার মনোমত একখানিও হইতেছে না। এমন সময়ে এক যুবক চিত্রকর রাজাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। রাজা চাহিয়া দেখিলেন— যুবকের মুখে অপূর্ব্ব প্রতিভা পরিস্ফুট! তিনি সস্নেহে বলিলেন, "কই তোমার চিত্র দেখি"।

যুবক সসম্মানে একখানি চিত্র রাজার হস্তে দিল। অদ্ভুত চিত্র, একখানি শীর্ণহস্ত মাত্র!

রাজা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই হস্তখানিতে দারুণ অর্থ-

লোলুপতা প্রকাশ পাইতেছে। নিতান্ত অর্থপ্রিয় কৃপণের হস্ত তাহা দেখিবামাত্রই অতি সহজে বুঝা যায়। হস্তখানির প্রত্যেক শিরা প্রশিরা যেন জীবিত ব্যক্তির মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। রাজা সভাসদ্‌দিগকে দেখিতে দিলেন।

এ অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইল। মানুষের মুখ দেখিয়া যাহা বুঝা যায় না, এই হস্ত দেখিয়া তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে। রাজা উৎফুল্ল দৃষ্টিতে পরম শ্রদ্ধাসহকারে যুবকের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি আমার এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। সুধু আমার রাজ্য বলি কেন সমস্ত জগতে তোমার তুল্য প্রতিভাবান্ চিত্রকর আছে কিনা জানি না। তুমি নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছ।

আমি অনেক উৎকৃষ্ট অভিনেতার অভিনয় দর্শন করিয়াছি, সাময়িক মুখভাব পরিবর্ত্তনে অনেকে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু হস্তখানি পর্য্যন্ত মনের ভাবপ্রকাশক এরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন অভিনেতা বিরল; তোমার দৃষ্টিশক্তি এত সূক্ষ্ম বিষয়ে নিহিত দেখিয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। এরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত কলা বিদ্যার প্রকৃত উন্মেষ হয় না। আমার অঙ্গীকৃত লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার লাভের তুমিই যোগ্যব্যক্তি। আমি রাজ-সরকার হইতে তোমাকে উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করিব। তুমি চিত্রশিল্পের উন্নতি করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল কর।"

তন্বী

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যুবক জানু পাতিয়া রাজাকে অভিবাদন করিল। হাত ধরিয়া রাজা দক্ষিণপার্শ্বে তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম।" বিনীতস্বরে যুবক বলিল, "পুরুষোত্তম।"

লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে পুরুষোত্তম প্রতিভা গ্রহণ করিল। প্রতিভাস্পর্শে পুরুষোত্তম পূর্ণপ্রতিভা লাভ করিয়া জগতে আদর্শ চিত্রকর হইল।

হাবা-মেয়ে

কাল কোল মেয়েটিকে যে দেখিত, সেই ভাল বাসিত। মেয়েটির নাম উমা। বড় বড় ভাসা ভাসা চোক, সর্ব্বদাই যেন জলে ভরা। লোকের মুখের দিকে যখন চোক দুটি স্থির করিয়া চাহিয়া দেখিত, তখন সকলেরই হৃদয়ে সে দৃষ্টিতে একটা করুণা জাগিয়া উঠিত।

মেয়েটির বয়স আট বৎসর। সে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না। দুটি একটি কথার সঙ্গে আকার ইঙ্গিতে মনের ভাব এত সহজে ও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিত যে, ক্ষুদ্র বালকবালিকারাও অতি সহজে তাহা বুঝিতে পারিত।

উমার পিতা যজ্ঞেশ্বর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। কোন সমৃদ্ধিশালীর বিষ্ণুমন্দিরের পূজকের কার্য্য করিতেন। দেবসেবাতেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত।

অতি বাল্যকালে উমার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। পিতা আর নূতন সংসারবন্ধনে পড়িলেন না, কন্যাটিকে পরমযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

উমা প্রাতঃকালে উঠিয়া পিতার সহিত স্নান করিত। অতি যত্নে সাজি ভরিয়া বকুল, শেফালি, করবী, কুন্দ প্রভৃতি

পুষ্প সংগ্রহ করিত। কখনও বসিয়া বসিয়া বড় বড় মালা গাঁথিত। অতি আগ্রহে সে মন্দিরের চাতালে বসিয়া পিতা: দেব-পূজা দেখিত।

সান্ধ্য আরতির পঞ্চপ্রদীপ ও শঙ্খ প্রভৃতির বিচিত্র ভঙ্গীর পরিচালনা সে অতি মনোযোগের সহিত দেখিয়া তাহারই অনুকরণে তাহার যত্নরক্ষিত শিলাখণ্ডকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় অতি নিপুণতার সহিত পূজা করিত।

তাহার শিলা-স্থাপিত বৃক্ষতল মন্দির অপেক্ষা অপরিষ্কৃত ছিল না, সে স্থল গোময়লেপনে সর্ব্বদা খট্‌খটে থাকিত। একটি দূর্ব্বাঘাস বা পাতা সেখানে পড়িতে পাইত না।

বাল্যকাল হইতেই উমার সহিত পশুপক্ষিদিগের কিছু অতি-রিক্ত ভাব। নাটমন্দিরের পারাবতকুল তাহাকে খুব ভাল করিয়া চিনে, সে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহারা উমার কাঁধে মাথায় হাতের উপরে আসিয়া বসে। উমার অস্ফুট বাক্য ও ইঙ্গিত তাহারা বেশ বুঝে। মন্দিরের পোষা বিড়ালটি উমার নিতান্ত অনুগত; সে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়, উমা কোলে করিয়া আদর করে, সেও ঘড়র্ ঘড়র্ করিয়া তাহার ভালবাসা জানায়।

গাছ হইতে একটা শালিকপাখীর ছানা পড়িয়া গিয়া ডানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, উমা সস্নেহে তাহাকে পালন করিয়া বড়

করিয়াছে ; সে আর উড়িয়া পলায় না। মন্দিরের কার্ণিসে থাকে, উমাকে দেখিলেই উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়ে।

উমা কাহারও কষ্ট দেখিতে পারে না, মন্দিরের দেশী কুকুরটি পর্য্যন্ত লেজ নাড়িয়া উমাকে তাহার হৃদয়ের ভালবাসা জানায়। উমা গলা ধরিয়া চুমা খায়। উমা তাহাদের বড় আপনার, তাহারাও উমার বড় আপনার।

একবার গ্রামে রক্ষাকালীপূজার সময় উমা তাহার সঙ্গিনীদের সহিত পূজা দেখিতে গিয়াছিল। নাচিয়া, নাচিয়া, ঢাক পিটিয়া আসন্নমৃত্যুভীত স্নাত ছাগশিশুটিকে হাড়কাঠে ফেলিয়া বলি দিবার উদ্যোগ হইতেছিল। কামার রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিয়া সুতীক্ষ্ণ খড়্গটি যখন জয় মা কালী বলিয়া বিশাল আস্ফালনে উত্তোলন করিল, ভীত ত্রস্তভাবে উমা কান্দিয়া সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

অন্যান্য বালক বালিকারা উমার এ অদ্ভুত ভাব দেখিয়া ভারি একটা আমোদ অনুভব করিল ; তাহারা ছুটিয়া গিয়া উমার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। উমা তখন মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌছিয়াছে। সে ভীতভাবে আকার ইঙ্গিতে বলিল,

"ড্যা ড্যাং ড্যা ড্যাং ড্যাং ইঃ"

জিভ্ বাহির করিয়া কালীমূর্ত্তির অনুকরণ করিল, কাঁপিয়া

পাঁঠার কম্পন দেখাইল, হাত তুলিয়া খাঁড়ার ভাব করিয়া ভীত-ভাবে বড় বড় চোক করিয়া বলিল, "ঘেঁচাং" ;—সঙ্গে খড়্গ-পতনের ভাব দেখাইল।

সেই অবধি বালক বালিকারা তাহাকে দেখিলেই বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলে "ড্যা ড্যাং ড্যা ড্যাং ইঃ—ঘেঁচাং।" হাত ধরিয়া টানাটানি করে ; সে ভয়ে কাঁটাটি হইয়া যায়, উমা কাহারও সহিত মিশে না ; সে মন্দিরপালিত পশুপক্ষী লইয়াই দিন যাপন করিত। মন্দিরমধ্যে উমা একাকী প্রতিপালিত হইতে লাগিল, সংসারের আবর্জ্জনাপূর্ণ হীনবৃত্তির বিশাল সংক্রামিত আকর্ষণ হইতে সে সম্পূর্ণ দূরে রহিয়া গেল।

বয়স বোবা কালা বিচার করে না। দেখিতে দেখিতে উমা চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিল। যৌবন কাহারও কথা শুনিল না, উমার দেহে ভর করিল। যৌবনলাবণ্যে উমা যমুনাতরঙ্গের মত ঢল ঢল করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মন অধিকার করিতে পারিল না। মনে মনে উমা তেমনই সরলা বালিকা রহিয়া গেল।

বামুনের ঘরের মেয়ে তাহাতে হাবা, পিতাও দরিদ্র ; এ ত্র্যহস্পর্শযুক্ত কন্যা পার করা কঠিন হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখে আর তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠে, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় ; কিন্তু উমার মুখের দিকে চাহিলেই

তাহার সেই সারল্যপূর্ণ বড় বড় চোক দুটি তাহাকে সকলই ভুলাইয়া দেয়; ব্রাহ্মণ ভাবে উমা আমার বালিকা।

বৎসর কাটিয়া গেল, উমার বর জুটিল না। ব্রাহ্মণ আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বিগ্রহের চরণে মাথা কুটিতে লাগিল; কিন্তু কোন দিকে কোন আশা দেখা গেল না।

অনেক সময়ে এমন ঘটনা ঘটে, মানুষের দৃষ্টি ও কল্পনা ততদূর অগ্রসর হইতে পারে না। গ্রামের রামশরণ বাঁড়ুয্যেরা নৈকষ্য কুলীন, তাহাদের পালটা ঘর সহজে মেলে না। একটি পাত্র স্থির করিয়া তিন চারি বৎসর ধরিয়া তাহাদের তত্ত্ব-তাবাস করিয়া আসিতেছিলেন; অবস্থাগতিকে কন্যার বিবাহ দেওয়া ঘটিয়া উঠিতেছিল না।

হঠাৎ ভাবী বৈবাহিক পত্র লিখিলেন, বৈশাখের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, নতুবা তিনি অন্যত্র পুত্রের বিবাহ দিবেন। সঙ্গে লম্বা এক গহনার তালিকা পাঠাইলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ অকূলসমুদ্রে পড়িলেন। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে রামশরণ বাঁড়ুয্যে জোতজমা বাস্তুভিটা ইত্যাদি বন্ধক দিয়া তিনশত টাকা সংগ্রহ করিলেন, বৈবাহিকের ফর্দ্দ পাঁচ ছয়শত টাকা।

ব্রাহ্মণ ভাবী বৈবাহিক তারাপদ মুখুয্যের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বেহাই, আমাকে রক্ষা

কর, আমি বড় গরীব। এই তিনশত টাকা সংগ্রহ করিয়াছি ; তুমি গ্রহণ করিয়া আমার জাতি রক্ষা কর।”

মুখুয্যে বিনা বাক্যব্যয়ে কোরা তিনশত টাকার তোড়াটি গ্রহণ করিলেন। পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, “বেহাই. দেখতেই ত পাচ্ছ, দিনকাল কেমন প’ড়েছে। যা হোক, তুমি ব্রাহ্মণ, কি আর বলিব, টাকা কয়েকটি না হয় জোগাড় করিয়া পরেই দিও।” বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

গরিবের মেয়ের বিবাহ ধূমধাম নাই, সময়ে বর আসিল। মুখুয্যে মহাশয় বিষয়ী লোক, বৈবাহিকের আভ্যন্তরিক অবস্থা বাহিরের দানসামগ্রী দেখিয়াই অনেকটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। বিবাহ হইয়া গেলে যে টাকা আদায় হইবে না, এ ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল হইল। তিনি বাকি টাকা না বুঝিয়া লইয়া কিছুতেই কন্যা পাত্রস্থ করিতে দিবেন না প্রকাশ করিলেন।

রামশরণ বাঁড়ুয্যে বেহাইএর হাতে পৈতা জড়াইয়া ধরিল, মুখুয্যের মন নরম হইল না ; বাঁড়ুয্যে পায়ে ধরিয়া কাঁদিল, মুখুয্যে পা সরাইয়া লইলেন, অটল পণ টলিল না। পাড়ার যুবকবৃন্দের অসহ্য হইয়া উঠিল। একজন বলিয়া ফেলিল, অমন চামারের সঙ্গে কার্য্য না করাই ভাল। আর যায় কোথা, ব্রাহ্মণ চটিয়া আগুন হইলেন। ‘যদি তোমার ঘরের কন্যা লই”—একটা কঠোর দিব্যি করিয়া পুত্র লইয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামশরণ বৈবাহিকের অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন নরম হইল না। ব্রাহ্মণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হলুদমাখা উপবাসী কন্যা; বাড়ীময় একটা কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। সুশীলকুমার নামক একটি যুবক বিবাহসভায় উপস্থিত ছিল, তাহাদের অবস্থা ভাল অথচ কুলীন। সুশীল বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল; সেই লগ্নে সুশীলের সহিত রামশরণের কন্যার বিবাহ হইয়া গেল।

তারাপদ মুখুয্যে যখন শুনিতে পাইল, বাড়ুয্যে জব্দ হয় নাই, বরং ভাল বরে ভাল ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছে, সে নিজকে আরও বেশী অপমানিত বোধ করিতে লাগিল। এ ক্ষেত্রে পুত্রের বিবাহ দিয়া না ফিরিয়া যাওয়া নিতান্ত লজ্জার বিষয়, তিনি সেই রাত্রেই যেমন করিয়া হউক পুত্রের অন্যত্র বিবাহ দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এদিকে মুখুয্যের এই অসঙ্গত ব্যবহারে গ্রামের সকলেই তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। একটু প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি সকলেরই হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। একজন বলিল, যজ্ঞেশ্বরের হাবা মেয়েটার এই সময়ে উপায় ক'রে দিলে হয় না? সকলের তাহাই মত হইল। মুখুয্যের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়া সেই রাত্রেই উমার সহিত মুখুয্যের পুত্রের বিবাহ দিয়া দিল।

পরদিন সকালে উমাকে পাল্কিতে তুলিয়া দিবার সময় যজ্ঞেশ্বর কন্যার হাত ধরিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। উমা ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারিল না, সেও পিতার সহিত কাঁদিতে লাগিল।

পাল্কি রওনা হইল। উমা অশ্রুপূর্ণনেত্রে মন্দিরের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। উমার পোষা কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। রুদ্ধ পাল্কির মধ্যে উমা বন্দী বন্য বিহঙ্গিনীর মত ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। আর এক এক বার মুখ বাহির করিয়া পার্শ্বগামী কুকুরকে দেখিতেছিল।

বউ দেখিয়া সকলেই খুসী হইল। উমা কাল হইলেও বেশ সুশ্রী ছিল। বৌয়ের লজ্জা কিছু কম। সকলেরই মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। হাঁ করিয়া বসিয়া কি ভাবে, কিছু বলিলেই চোক ছল ছল করে, কাহারও সহিত কথা বলে না।

উমার ছোট ননদ বলিল, বৌ কি বোবা! কথাটা ক্রমশঃ বিস্তৃত আকার ধারণ করিল। অবশেষে অনেক পরীক্ষার পর স্থির হইল, বৌ বোবাই বটে। যত ঝাল উমার উপর পড়িতে লাগিল; যেন উমাই ছলনা করিয়া তাহাদিগকে বড় ঠকাইয়াছে।

নির্য্যাতনে উমা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার মন নাটমন্দিরের পায়রাগুলি, ডানাভাঙ্গা শালিক পাখিটি, মেনি

বিড়ালটির প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। ছুটিয়া মন্দিরে যাইবার তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু সে বন্দী। সে বড়ই কাতরভাবে হাতজোড় করিয়া কায়মনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, আমায় তোমার কাছে নিয়ে চল, আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে।"

মর্ম্মাহত উমার স্বামী লজ্জায় বাড়ীর ভিতরে আসিল না। এ অভাবনীয় ঘটনায় বিবাহের আনন্দ নষ্ট হইয়া গেল।

অষ্টমঙ্গলার পর উমা আবার মন্দিরে পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। কি মুক্তি, কি তৃপ্তি! উমা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। উমার শ্বশুরও উমাকে পাঠাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। শীঘ্রই দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিলেন। মুখুয্যে এবার কষিয়া মাজিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই মুখরা বধূর দাপটে তাঁহার সেই অবলা সরলা হাবামেয়েটীর মুখখানি যখন তখন মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কি অন্যায় করিয়াছি! কিন্তু পুত্রের ভয়ে ভবিষ্যতে উমার আর কোন তত্ত্ব করিলেন না।

উমা এখন পূর্ণ যুবতী। লাবণ্যে সে কাল অঙ্গ ঢল ঢল ছল ছল করিত। কালতে অতরূপ প্রায় দেখা যায় না। সে এখন মন্দিরে পিতার কার্য্যের অনেক সহায়তা করে, পূজা লইয়াই ব্যস্ত। তাঁহার যৌবনের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহার

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লবনী অবনী বহিয়া যায়", উমা তাহা ফিরিয়াও দেখে না।

উমার পিতা একদিন সন্ধ্যার সময় আরতি করিয়া বলিলেন,—"মা, আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, আমি বাড়ী যাই, তুমি মন্দিরের কাজ সেরে এস।"

উমা মন্দিরের কাজ সারিয়া বাড়ী গিয়া দেখিল, পিতার প্রবল জ্বর হইয়াছে। সে সমস্ত রাত্রি পিতার কাছে বসিয়া তাঁহার হাত, পা ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"মা, তুমি স্নান করিয়া মন্দিরে যাও, নইলে সেবার নানারূপ ত্রুটি হবে। আমি হরি বাঁড়ুয্যের ছেলেকে পূজা করিতে পাঠাইয়া দিতেছি।"

উমা আসিয়া মন্দির পরিষ্কার করিল। নিপুণতার সহিত সে পূজার সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিল। একটু বেলা হইতেই হরি বাঁড়ুয্যের পুত্র নিবারণ পূজা করিতে আসিল, মাথায় ঝেঁকড়া ঝেঁকড়া কোঁকড়া চুল, বর্ণ গৌর, টানা টানা চোক বেশ রক্তাভ, কাঁধে একখানি সৌখীন গামছা। বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসর। পাড়ায় গঞ্জিকার আড্ডায় একদমে একছিলিম গাঁজা পোড়াইতে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না।

সে পূজা করিতে আসিয়াই লোলুপ দৃষ্টিতে এক একবার উমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। উমার সে দিকে কোন

লক্ষ্য ছিল না, থাকিলেও সে তাহা বুঝিতে পারিত না, কারণ সে সে আবর্জ্জনাপূর্ণ সংসারে থাকিয়াও সম্পূর্ণ নির্ম্মলভাবে গঠিত হইয়াছিল।

মানুষ যে আদর্শে পশুবৃত্তি শিক্ষা করে, সে আদর্শ সন্দর্শন তাহার জীবনে ঘটে নাই। সে মন্দির লইয়াই থাকিত, মন্দিরের পশুপক্ষীই তাহার খেলার সঙ্গী ছিল: কাজেই তাহার নির্ম্মল-চিত্তে কোনরূপ পাশবিক বৃত্তির বিকাশ হইবার অবকাশ ঘটে নাই।

তিন চারিদিন যজ্ঞেশ্বর পূজা করিতে আসিতে পারিলেন না, নিবারণই পূজা করিতে লাগিল। সে নির্জ্জনে পাইলেই নানা-রূপ আকার ইঙ্গিতে উমাকে মনোভাব প্রকাশ করিত, উমা কিছুই বুঝিতে পারিত না, ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিত।

নিয়ত কুবৃত্তিচালিত যুবকের প্রবৃত্তি দমন অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে অবসরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার আরতির পর মন্দিরের সকলে চলিয়া গিয়াছে, উমা মন্দি-রের খুঁটিনাটি কাজ করিতেছিল, নিবারণ হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

নাগপাশবেষ্টিতা কুরঙ্গিণীর মত উমা আতঙ্কে কেমন এক রকম হইয়া গেল। সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুখ

হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না, কাতর ভীত দৃষ্টিতে নিবারণের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

উমার ভীত রক্তহীন মুখমণ্ডলের নিষ্প্রভ চক্ষুর দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু নিহিত শক্তি ছিল, তাহা দেখিয়া নিবারণের কেমন ভয় হইল, সে এরূপ কার্য্য পূর্ব্বে কখনও করে নাই, তাড়াতাড়ি উমাকে ছাড়িয়া দিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেল!

সম্পূর্ণ অজানিত এই বীভৎস ব্যাপারে উমা যেন কেমন হইয়া গেল; সে ধীরে ধীরে বাড়ীতে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। আতঙ্কে উমার প্রবল জ্বর হইল, সে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

যজ্ঞেশ্বর বড় কাতর হইয়া পড়িলেন, প্রাতেই উমার বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। ব্রাহ্মণ কন্যা লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। উমা রাত্রির ঘটনা পিতাকে কিছুই বলে নাই। ইচ্ছা থাকিলেও বুঝি সে ঘটনা বুঝাইতে পারিত না, কেন না এই প্রকার ব্যাপার সংসারে আছে, তাহা উমার কখনও কল্পনায়ও আসে নাই। সে যুবতী হইলেও পবিত্র সারল্যপূর্ণ বাল্যভাব ব্যতীত তাহার হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত কোন ভাবেরই বিকাশ হয় নাই।

এই বীভৎস ভাবের আভ্যন্তরিক আভাস উমা তাহার জীবনে কখনও অনুভব করে নাই। হিংস্র পশুতাড়িত বালিকা যেমন

আতঙ্কে কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়া পড়ে, উমাও সেইরূপ নিবারণের পাশব ব্যবহারে ভয়ে ও আতঙ্কে অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিল।

যজ্ঞেশ্বর কন্যার শিয়রে বসিয়া আছেন, উমা থাকিয়া থাকিয়া যেন কি একটা আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, এমন সময় বাহিরে নিবারণ ডাকিল, "দাদা মহাশয়, আজ পূজা কর্‌তে যাবে না।" সে স্বরে ভয় ও উদ্বেগ মিশ্রিত ছিল।

কল্যকার ঘটনা লইয়া কোন গোলযোগ হইয়াছে কি না, নিবারণ তাহার খোঁজ লইতে আসিয়াছিল। যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, "না, উমার বড় অসুখ।"

নিবারণের কণ্ঠস্বর উমার কর্ণে পৌঁছিবামাত্র উমা দারুণ আতঙ্কে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সেই ভীত চীৎকারে নিবারণের বক্ষের সমস্ত হৃৎপিণ্ড কে যেন সবলে চাপিয়া ধরিল, তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল, সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় নিবারণ আবার চোরের মত উমার অসুখের সন্ধান লইতে আসিল। কি যেন অজানিত একটা দারুণ বেদনায় থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুক ভাঙ্গিয়া দিতেছিল।

গোধূলির অন্ধকারে ধরণী ঈষৎ ম্লান, ঘন বৃক্ষচ্ছায়ায় উমাদের বাড়ী অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক অন্ধকার। তেমনি

একটা বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিবারণের সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। সে ধীরে ধীরে উঠানের দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর ভিতরেও অন্ধকার, কাহাকেও ডাকিতে সাহস হইল না, স্তব্ধ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠিক সেই সময়েই ভিতরে একটা করুণ ক্রন্দনের রোল উঠিল, পায়রাগুলি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে উঠানের ভিতর হইতে উমার পোষা কুকুরটি গভীর মর্ম্মস্পর্শী স্বরে "হু—উ, হু—উ" করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিবারণের সমস্ত বুক শূন্য হইয়া গেল।

ছায়া-শিশু

সংসারানভিজ্ঞ অতুলচন্দ্র, স্বর্ণময় ভবিষ্যতের অত্যুজ্জ্বল সুখস্বপ্ন লইয়া এল, এম, এস, পাস করিল। তাহার সংসারে একমাত্র বিপত্নীক খুল্লতাত ছিলেন ; তিনিই এতদিন অতুলচন্দ্রের পাঠের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন। অতুলচন্দ্রের সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তা করিবার কারণ উপস্থিত হয় নাই। হঠাৎ খুল্লতাতের মৃত্যু হইল। সংসারে তখন অতুলচন্দ্র সম্পূর্ণ সহায়হীন ও একাকী হইয়া পড়িল।

কিছুদিন পরেই কার্য্যক্ষেত্রে সংসার সম্বন্ধে তাহার অন্যরূপ ধারণা হইল ;—ইহার পথ ঠিক সরল নহে,—তাহা প্রায়ই বাঁকা, পৃথিবীটার অনেকাংশেই গোল বটে। এতদিনে তাহার যথার্থ ভুগোলপাঠ আরম্ভ হইল।

সাহেবি ধরণের সাধ্যের অতিরিক্ত মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, রৌপ্য-মণ্ডিত টেথিস্কোপ ব্যবহার অভাবে ক্রমশঃই মলিন হইয়া পড়িতে লাগিল। কাজেই অতুলচন্দ্র স্বাধীন ব্যবসায়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া চাকরীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

ষ্টেটস্‌ম্যানের "ওয়াণ্টেড্" কলমের একটিও বাদ গেল না, মনে খুব আশা ছিল, একশত টাকার একটি চাকুরী তাহার

বিত্তার তুলনায় অতি লঘু। কিন্তু তাহাও ছয় মাসের মধ্যে জুটিল না।

আরও ছয়মাস গেল, কিন্তু একখানিও নিয়োগলিপি আসিল না। তখন সে মহাস্বদেশী হইয়া পড়িল, বন্ধুবান্ধবের নিকট বলিতে লাগিল। দেশের টাকাপরে লইয়া যাইতেছে, পরের টাকা ঘরে আনিয়া দেশবাসীর আদর্শ হইব।

হায়! এত ত্যাগস্বীকার করাতেও স্বদেশ কি বিদেশে কেহ তাহার মূল্য বুঝিল না। পরিশেষে সে বেশ বুঝিতে পারিল, এ ক্ষীণলতিকা আশ্রয় ব্যতিরেকে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। তখন সে মুরুব্বীর অনুসন্ধানে ঘুরিতে লাগিল।

মিষ্টভাষী অনেক সদাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সকলেই আশা দিলেন, মুক্তহস্তে সার্টিফিকেট লিখিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার দরিদ্রতার মুক্তি ঘটিল না। একজন জল খাওয়াইলেন, চেয়ার হইতে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আকাশের চন্দ্র হাতে দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার বিনয়ের ও উদারতার প্রশংসা শতমুখে করিতে করিতে অতুলচন্দ্র গৃহে আসিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাক্ষাৎ হইল, বিনয় ও জলখাবার সবই পূর্ব্ববৎ আসিল, কিন্তু সে যাহা চায়, তাহা পাইল না। তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, আরও করিবেন। তাহাকে একটি চাকরী না দিলে তাঁহার রাত্রিতে সুনিদ্রা হইতেছে

না, ইত্যাদি অনেক কথা শুনিয়া অতুলচন্দ্র ঘরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার দুরদৃষ্টবশতঃ ছয় মাসের মধ্যে সে তাহার মুরুব্বীর সুনিদ্রার কারণ হইতে পারিল না।

অতুলচন্দ্র দেশের লোকের উপর চটিয়া আগুন হইল, আর দেশের মুখের দিকে চাহিবে না। যে দেশের লোক গুণের আদর জানে না, সে দেশের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? দেশের উপর অনেক চোক রাঙ্গাইয়া অনেক ভয় দেখাইয়া, সে কত গালি দিল। কিন্তু তাহাতে দেশকে কিছুমাত্র বিচলিত হইতে দেখা গেল না।

অবশেষে অতুল পোর্টকমিশনরের আফিষে জাহাজে চাকরীর জন্য নাম লেখাইয়া আসিল, কিন্তু তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। দেশ ছাড়িয়া যাইবে তাহাতেও বাধা।

দুই তিন মাস কোন সংবাদ আসিল না। অবশেষে আমেরিকা-গমনোন্মুখ একখানি জাহাজে ডাক্তার হইয়া সে আমেরিকায় যাইবে স্থির করিল। জাহাজ ছাড়িবার নির্দ্দিষ্ট দিনে সে তাহার জিনিষপত্র গুছাইয়া জাহাজে গিয়া উঠিল। সময়ে জাহাজ ছাড়িল।

আজও তাহার জন্য দেশের লোকের এক ফোঁটা চোখের জল পড়িল না, তাহারই দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

নীলাম্বুসাগরে নাচিতে নাচিতে জাহাজ গন্তব্যস্থানাভিমুখে চলিল। রবিকর-কিরণোদ্ভাসিত বিচিত্রবর্ণ জলধিতরঙ্গ জ্যোৎস্নার

অমল ধবল বিরাট সৌন্দর্য্য স্বদেশবিরহকাতর যুবকের দিনকতক ভাল লাগিল বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাহা নিতান্ত পুরাতন ও নৈরাশ্যপূর্ণ দুঃখের আকর হইয়া দাঁড়াইল।

ব্যথিতচিত্ত যুবক ডেকের রেলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া অস্তমিত সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া স্বদেশের স্নিগ্ধ বিটপীপূর্ণ কুঞ্জের ছায়া কল্পনা করিত, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, প্রত্যেক তরঙ্গাঘাতশব্দে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত।

হায়! দেশে তাহার পিতা মাতা কেহই নাই, তাহার জন্য কাহারও চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়িবে না। এককাঠা বাস্তুও তাহার নিজের বলিয়া ছিল না, তথাপি দেশের জন্য তাহার এত ব্যাকুলতা কেন, যুবক তাহা ভাবিয়া পাইত না। স্বদেশ! রক্ত মাংস তোমার রেণুকণায় গঠিত, তাই বুঝি এ দারুণ আকর্ষণ! যাহার কেহ নাই, তাহার তুমি আছ, তাই বুঝি তোমার এ আকুল আহ্বান!

অনেক বন্দর ঘুরিয়া ফিরিয়া জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। জাহাজের কাপ্তেন অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদের সঙ্গে ফিরিয়া যাইবে, না এইখানেই থাকিবে।"

অতুলচন্দ্রের অর্থ নাই; বুঝি থাকিলেও অতুলচন্দ্র বিদেশে থাকিতে পারিত না। সে বলিল, "না সাহেব, আমি তোমাদের সঙ্গেই ফিরিব।"

সাতদিন অপেক্ষা করিয়া জাহাজ পুনরায় ভারত অভিমুখে যাত্রা করিল। অতুল চন্দ্রের আজ কত আনন্দ, তাহা অতুল-চন্দ্রই জানে। যে সমুদ্রতরঙ্গে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত, আজ সেই তরঙ্গে তাহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল।

তিন চারি দিন চলিয়া গিয়াছে। অতুলচন্দ্র ডেকের উপর একখানি চেয়ারে বসিয়া প্রাতঃসূর্য্যোদয় দেখিতেছিল। রত্নাকর-গর্ভ হইতে মহিমমণ্ডিত রক্তবর্ণ অরুণ ধীরে ধীরে তাঁহার বিশাল শির উত্তোলন করিতেছিলেন। দীপ্ত সূর্য্যরশ্মিতে সমস্ত দিক্ পূর্ণ নীল তরঙ্গ রক্তবর্ণ হইয়া হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল, শ্বেতপক্ষ সামুদ্রিক পক্ষী স্বর্ণকিরণমণ্ডিত হইয়া জলের উপর উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল। চতুর্দ্দিকে জলরাশি আকাশ স্পর্শ করিতেছিল। অসীম অনন্ত বিশ্বের ক্ষীণ কল্পনা অতুলচন্দ্র মনে মনে বেঁশ অনুভব করিতেছিল। হাতের সংবাদপত্র হাতেই ছিল, তাহা পড়িবার অবকাশ ছিল না।

এমন সময় জাহাজের কাপ্তেন আসিয়া বলিল, "ডাক্তার, এখন তোমার অবসর আছে কি ?" চেয়ার ছাড়িয়া অতুলচন্দ্র দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মহাশয়" ?

কাপ্তেন বলিলেন, "ক্যাবিনে একজন মহিলা অসুস্থ, তাঁহাকে দেখিতে হইবে।"

অতুলচন্দ্র যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কাপ্তেন ঈষৎ

হাসিয়া বলিলেন, তোমার যাত্রা শুভ, "রোগিণী তোমার স্বদেশবাসিনী একটী সুন্দরী যুবতী।"

অতুলচন্দ্র কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার রোগিণীকে দেখিবার একটা দারুণ আগ্রহ উপস্থিত হইল।

ক্যাবিনে প্রবেশ করিতেই একজন প্রৌঢ়া বঙ্গমহিলা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং অনুগ্রহের জন্য কাপ্তেনকে ধন্যবাদ করিলেন, অবশ্য অতুলচন্দ্রও বাদ পড়িল না।

প্রৌঢ়া অপূর্ব্ব সুন্দরী, গাঢ়কৃষ্ণ কেশ, কাকচক্ষুবিনিন্দিত স্বচ্ছ সুন্দর চক্ষু, দেহের গঠনও পরিপাটি। পরিচ্ছদ বঙ্গদেশের সাড়ীপরা ব্রাহ্ম-মহিলাদিগের অনুরূপ। মুখ মহিমমণ্ডিত, বর্ণ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃপূর্ণ গৌর। বয়স কিছু অধিক হইলেও এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই।

কাপ্তেন পরিচয় করিয়া দিলেন, মহিলা মিসেস্ আরকট। তাঁহার স্বামী বঙ্গের একজন কালেক্টর। আমেরিকায় তাঁহার স্বামীর বাড়ী। কার্য্যোপলক্ষে স্বামী পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে গিয়াছেন। তিনিও তাঁহার কন্যা মিস্ অরুণা সেই খানেই যাইতেছেন। তাঁহার কন্যাটি অসুস্থ।

কাপ্তেন কার্য্যানুরোধে বিদায় হইলেন। অতুলচন্দ্র রোগিণীকে দেখিতে মহিলার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী ক্যাবিনে প্রবেশ করিল।

পরিচ্ছন্ন বিছানায় একটি পরমা সুন্দরী যুবতী শুইয়া আছে। মিসেস্ আরকট বলিলেন "ইনিই আমার কন্যা"। অতুলচন্দ্র অনিমিষ লোচনে দেখিতে লাগিল, তেমন সুন্দর, সে আর জীবনে দেখে নাই। সুবঙ্কিম বড় বড় কৃষ্ণচক্ষু, রেশমগুচ্ছ অপেক্ষাও সুকোমল সুদীর্ঘ কুঞ্চিত চাঁচর কেশ, মসৃণ ললাট, রক্তাভ গণ্ড, সরস ক্ষীণ ওষ্ঠ, পুষ্পবল্লরীসদৃশ বাহু; চম্পকবর্ণা সুন্দরী পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের সারসংগ্রহ, জীবন্ত কাব্যকল্পনাময়ী মূর্ত্তি!

অতুলচন্দ্র শয্যাপার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসিল। অর্দ্ধপরিস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখন কিরূপ বোধ করিতেছেন?"

ঈষৎ ওষ্ঠ সঞ্চালনে ক্ষীণ হাসির রেখা যুবতীর মুখমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল। সে অপূর্ণ সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। ক্ষীণ দন্তের রেখা ঈষৎ দেখা গেল, বুঝি হস্তিদন্তও অত মসৃণ নহে; সুন্দর সুগঠিত দন্ত তাহাতে কুসুমদীপ্তি।

অরুণা বলিল, "মাথাটা বড় ব্যথা কর্‌ছে।" স্বরের কি মধুর মিষ্ট ঝঙ্কার! অতুলচন্দ্রের সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ খেলিল। যুবতী বাঙ্গালাভাষাতেই কথা বলিতেছিল। অতুলচন্দ্র বলিল, "দেখ্‌ছি আপনার সামুদ্রিক পীড়া হয়েছে।" পরে মিসেস্ আরকটের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভয় নাই, শীঘ্রই আরাম হবেন।" আশ্বস্তা হইয়া প্রৌঢ়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ করিলেন।

অতুলচন্দ্র একটা ঔষধ তৈয়ারি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। রূপমুগ্ধ অতুলচন্দ্র ডেকের উপর আসিয়া মিস্ অরুণার মুখখানি ভাবিতে লাগিল, সে তখন বাহ্যজ্ঞানবিরহিত। "ডাক্তারবাবু দেখ্ছি সমুদ্র বড় প্রিয়" চমকিত হইয়া অতুলচন্দ্র ফিরিয়া দেখিল মিসেস্ আরকট। ব্যস্তভাবে অতুলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কন্যা এখন একটু আরাম বোধ কর্‌ছেন কি ?"

মিসেস্ আরকট। সেইজন্যই ত আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে এলেম।

অতুলচন্দ্র। কিছু না, কি হয়েছে বলুন।

মিসেস্ আরকট। সে এমনি একগুঁয়ে মেয়ে, কিছুতেই ওষুদ খাবে না, যদিও অনেক কষ্টে খাওয়াইলেম, তাও তুলে ফেল্‌লে; তাতে আরও হিতে বিপরীত হয়েছে, কেবলই বমি কর্‌ছে।

অতুলচন্দ্র চলুন দেখি বলিয়া মিস্ আরকটের সহিত ক্যাবিনে গেল। অরুণা কিছুতেই ঔষধ খাইবে না, অতুলচন্দ্রও ছাড়িবার পাত্র নন, অনেক করিয়া ঔষধ খাওয়াইলেন।

মিসেস্ আরকট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ও মেয়ের সঙ্গে পার্‌বে কে ?" বাবা, তুমি ছিলে, তাই ওষুধ খেলে, নইলে আমার কি সাধ্যি যে- ওকে ওষুধ খাওয়াই।

বরাবরই ঐ রকম ভুগে ভুগে কষ্ট পাবে, তবু ওষুধ খাবে না।" রমণী ইংরাজগৃহিণী হইলেও বঙ্গরমণীর স্বাভাবিক সরলতা ভুলেন নাই। অতুলচন্দ্র বলিল, "সে জন্য কোন চিন্তা নাই, আমিই এসে এসে ওষুধ খাইয়ে যাব এখন।"

মিসেস্ আরকট ভারি খুসী হইলেন। "বাবা, আমাদের উপর তোমার ভারি দয়া। আমারও কেবল ঐ মেয়েটি।" তাঁহার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অতুলচন্দ্র মনে মনে বড়ই আনন্দলাভ করিল। কেন না বন্ধুবান্ধবহীন স্বদেশত্যাগী যুবক উদ্দেশ্যবিহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবন লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রে মজ্জমান ব্যক্তির মত সম্মুখে যে অবলম্বন পাইল, ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিল।

ঔষধ খাওয়াইবার অছিলায় অতুলচন্দ্র ঘন ঘন ক্যাবিনে আসা যাওয়া করিতে লাগিল। দু এক দিনের মধ্যেই এই আরকট পরিবারের সহিত তাহার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল।

এখন অরুণা অতুলচন্দ্রের সহিত অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলে, অতুলচন্দ্রেরও সঙ্কোচ নাই। অবসর সময়ে তাহাকে বই পড়িয়া শুনায়, দুজনে নানা বিষয়ের গল্প করে। মিসেস্ আরকট নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাহারা দুইজনে একই ক্যাবিনে অনেক সময় নির্জ্জনে কাটায়।

বহুদিনের পর এই নির্জ্জন সমুদ্রে একজন স্বদেশবাসীকে পাইয়া অরুণা অতুলচন্দ্রের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িল।

একদিন অতুলচন্দ্র মিসেস্ আরকটকে বলিল, "এমন ক'রে চব্বিশ ঘণ্টা বদ্ধ-ঘরে শুয়ে থাক্‌লে রোগ সার্‌তে বিলম্ব হবে, এক আধবার বাহিরের হাওয়ায় বসিবার দরকার।"

মিসেস্ আরকট বলিলেন, "তা বেশ ত, ওকে বুঝিয়ে তারি ব্যবস্থা কর না।"

অতুলচন্দ্র অরুণাকে বাহিরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। অনেক কষ্টে অতুলচন্দ্রের দেহাবলম্বন করিয়া অরুণা ক্যাবিনের বাহিরে চেয়ারে আসিয়া বসিল। পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই অরুণা অনেকটা ভাল হইল, তাহারা উভয়ে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ডেকে আসিয়া বসে।

অতুলচন্দ্রের চক্ষে এখন সমুদ্র অতুল শোভাময়। অনন্ত আকাশ ও সমুদ্রের মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, অতি আনন্দে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। যে অতুলচন্দ্র স্বদেশে ফিরিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র ছিল, এখন জাহাজ কোন কারণে কোন বন্দরে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত থাকিলে সে মনে মনে আনন্দলাভ করে। তাহার হৃদয় অরুণাময়, জগৎ অরুণাময়। সংসারে স্নেহ অবলম্বনবিহীন অতুলচন্দ্র পূর্ণভাবে অরুণাকে অবলম্বন করিয়া, তাহার হৃদয়ের প্রেম, ভালবাসা তাহারই চরণে

উৎসর্গ করিল, অরুণাও আপনার অজ্ঞাতসারে অতুলকে ভাল-বাসিয়া ফেলিল।

এখন আর তাহাদের কথা শেষ হয় না, মুহূর্ত্ত অদর্শন যুগ বলিয়া মনে হয়। নবপ্রেমোদ্ভাসিত বিচিত্র প্রেমতরঙ্গে প্রেমমুগ্ধ দুইটি হৃদয় কোন ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া সুখসাগরে ঝম্প প্রদান করিল। মিসেস্ আরকট এ সকল লক্ষ্য করিয়াও করিলেন না। হায়, সময়ে লক্ষ্য করিলে বোধ হয় সুদূর ভবিষ্যৎ বিষময় হইত না।

পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রকিরণ সমুদ্রতরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া উজ্জ্বল রৌপ্যগুঁড়ার মত সাগরময় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অতুলচন্দ্র বলিল, "অরুণা, আমার এ দুরাশা!" সাদরে তাহার হাত দুটি ধরিয়া অরুণা বলিল, "না অতুল দুরাশা নহে, আমি তোমা ভিন্ন আর কাহারও নই।"

অরুণা প্রবল আগ্রহে অতুলচন্দ্রের কণ্ঠ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। অতুলচন্দ্র আপনাকে ভুলিল, জগৎ ভুলিল, ভবিষ্যৎ ভুলিল, মুহূর্ত্তে মোহময় ভাব-প্রাবল্যে নির্জ্জন জ্যোৎস্নালোকে উভয়ে উভয়কে আত্মোৎসর্গ করিল।

সময়ে আরকট-পরিবারের সহিত অতুলচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মিষ্টার আরকট স্বয়ং তাহাদিগকে

অভ্যর্থনা করিবার জন্য ডকে আসিয়াছিলেন। মিসেস্ আরকট স্বামীর সহিত অতুলচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

কলিকাতায় অতুলচন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। মিসেস্ আরকটের অনুরোধে সে তাহাদের বাটীতেই অতিথিরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মিষ্টার আরকট অতুলচন্দ্রের প্রতি অতি সদয়ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তথাপি পরাশ্রয়ে অতুলচন্দ্র নিজের নিকট লজ্জিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই ঘটনাচক্রে সে কারণ পরিবর্ত্তিত হইল।

মিসেস্ আরকট অসুস্থা হইয়া পড়িলেন। অথচ মিঃ আরকটের কর্ম্মস্থান তত স্বাস্থ্যজনক নহে। তাঁহার স্ত্রীর দিনকতক কলিকাতায় থাকাই ডাক্তারগণের অভিমত হইল। অতুলচন্দ্র ডাক্তার; এ অবস্থায় তাহার সাহায্য তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল।

মিঃ আরকট অতুলচন্দ্রের কোন কর্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার পরিবারদিগের অভিভাবকস্বরূপ থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতুলচন্দ্র স্বীকৃত হইল। মিঃ আরকটের ছুটির সময় ফুরাইয়া আসায় তিনি কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

এইরূপে প্রায় একবৎসর কাটিয়া গেল। অতুলচন্দ্রের সুবিধাজনক কর্ম্ম জুটিল না। যাহা দু একটি জুটিল, তাহাও মিসেস্ আরকট ও অরুণার মনোমত হইল না। কাজেই

তাহাকে আরকট-পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতে হইল। অরুণা ও অতুলের প্রণয়ের বন্ধন ক্রমশঃই দৃঢ় হইতে লাগিল।

আরকট-গৃহিণী অনেকটা সুস্থা হইলেন। মিঃ আরকটও কলিকাতায় আসিয়াছেন। একজন নূতন সিভিলিয়ান যুবকের সহিত অরুণার বিবাহ স্থির হইয়াছে, শীঘ্রই যুবকের কোর্টসিপের জন্য আসিবার সম্ভাবনা আছে।

অরুণা লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে। তাহার বেশবিন্যাসে স্পৃহা নাই। কে যেন সুন্দর বদনে চিন্তার কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। অতুলচন্দ্রও বিমর্ষ বিশুষ্ক।

অরুণালাভের আশা নাই, কোনকালে ছিলও না। স্বেচ্ছাকৃত অপরাধে অতুলচন্দ্র আজ প্রপীড়িত। যাহার কেহ নাই, তাহার কেহ হইলে, সে তাহার সর্ব্বস্ব যাচিয়া তাহার পদতলে অর্ঘ্য দেয়। অতুলচন্দ্রের সেই অবস্থা।

অরুণা ভিন্ন বিশাল জগতে আর তাহার প্রিয় কিছুই নাই। তাহার সর্ব্বস্ব অরুণা। অরুণা তাহার সাধনা, অরুণা তাহার জীবনপ্রবাহ।

এখন দেখা হইলে দুজনেই কাঁদে, কোন কথাই হয় না। রুদ্ধহৃদয়োচ্ছ্বাস কণ্ঠ ছাপাইয়া আসিতে পারে না।

একদিন সন্ধ্যার সময় ইডেন গার্ডেনের নির্জ্জন কুঞ্জে দুজনে বসিয়া আছে। দুজনের হস্ত দুজনের হস্তে দৃঢ়ভাবে

আবদ্ধ, দুজনেরই চোখে জল। কম্পিত কণ্ঠে অরুণা বলিল,—

"ভগবানের মনে যাহা আছে পরে হবে, এখন আমায় এ দারুণ লজ্জা থেকে ত্রাণ কর।"

অরুণা অন্তঃসত্ত্বা। তাহার কথা শুনিয়া অতুলচন্দ্রের সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে কম্পন অনুভব করিয়া, অরুণা লজ্জা ও অনুতাপে বদন নত করিল। দৃঢ়ভাবে অতুলচন্দ্র বলিল,—"তোমার জন্য আমি জগতের সব মহাপাপ করিতে পারি, এও করিব, তোমাকে ঔষধ দিব।"

তড়িদ্‌বেগে অতুল কুঞ্জান্তরালপথে অন্তর্হিত হইল। অরুণা নির্জ্জন কুঞ্জে একাকিনী বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

তার পর একবৎসর চলিয়া গিয়াছে। মিঃ আরকটের যত্নে অতুলচন্দ্রের একটি ভাল কর্ম্ম হইয়াছে। হাঁসপাতালের চার্জ্জ, পসারপ্রতিপত্তিও মন্দ নয়। বাহিরে বেশ সুখেই দিন যাইতেছে, কিন্তু অন্তর ত কেহ দেখিতে পায় না। অতুল সর্ব্বদাই বিমর্ষ। অরুণার এখনও বিবাহ হয় নাই, সে প্রায়ই অতুলচন্দ্রকে পত্র লেখে। এই বিদেশে অতুলচন্দ্রের তাহাই মরুভূমির নির্ঝরিণী।

বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, অতুলচন্দ্র বাংলোর সম্মুখ

উদ্যানে পাইচারি করিতেছিল, ঠিক সম্মুখে রাস্তার অপর পারে স্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলিতেছে। বাংলোর পশ্চাতে আম্র-বৃক্ষের মাথার উপর পতনোন্মুখ সূর্য্য চিক্ চিক্ করিয়া হাসিতেছে। এমন সময় টেলিগ্রাফ-পিয়ন আসিয়া সেলাম দিয়া অতুলচন্দ্রের হস্তে একখানি টেলিগ্রাফ দিল। টেলিগ্রাফে লেখা আছে "শীঘ্র আইস, মিঃ আরকট সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় পীড়িত, মিসেস্ আরকট।"

তখনই তাড়াতাড়ি সিভিল সার্জ্জনের নিকট ছুটি লইয়া অতুলচন্দ্র কলিকাতায় রওনা হইল।

মিঃ আরকটের পীড়ার বড় বাড়াবাড়ি, আহারনিদ্রা ভুলিয়া অরুণা পিতৃসেবা করিতেছে। কত আগ্রহ, কত যত্ন! দেখিয়া অতুলচন্দ্রের মনে হইল, সত্যই রমণী সংসারে দেবী। পৃথিবীর মত ধৈর্য্য লইয়া অরুণা অটল অচল ভাবে পিতৃসেবা করিতেছিল।

মৃত্যুরোগ হইলে কেহই বাঁচাইতে পারে না। বৃদ্ধ আরকটের মৃত্যুসময় নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি অতুলকে নিকটে ডাকিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন,—

"আমার অরুণাকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহার ধমনীতে দেশীয় রক্ত আছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের মিলন মধুময় হইবে। আমি ভ্রান্ত, তাই এতদিন অরুণার মনোভাব

বুঝিয়াও বুঝি নাই। সে তোমাকে ভিন্ন সংসারে সুখী হইবে না। পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলে এতদিন বৃথা পাত্র অনুসন্ধান করিতাম না, সানন্দে তোমাদের মিলন দেখিয়া যাইতাম। আমার অদৃষ্টে সে সুখ নাই। তথাপি তোমরা সুখী হইবে মনে করিয়া আমার আত্মা পরলোকে তৃপ্ত হইবে। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দান করিলাম। আমার প্রিয়তমা পত্নী তোমাদের সংসারভুক্তা হইয়া থাকিবেন।" আরকটের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি চিরজীবনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

অরুণার সহিত অতুলচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অতুলের আর্থিক অবস্থারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রথম মিলনে যে সুখ, যে শান্তি ছিল, হায়, শত চেষ্টাতেও আজ সে সুখশান্তি আসে না কেন? দুই জনেই দুই জনের জন্য উন্মত্ত, দুই জনেই দুই জনকে প্রাণের সহিত ভালবাসে; কিন্তু মধ্যে এ কিসের ব্যবধান! কেহই তাহা ভাবিয়া পায় না!

অরুণা আসন্নপ্রসবা। অতুল তাহাকে তাহার মাতার নিকট কলিকাতায় পাঠাইল। কারণ কলিকাতায় প্রসব সম্বন্ধে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম। সময়ে টেলিগ্রামে সংবাদ আসিল, 'তোমার একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' অতুলচন্দ্রের কত আনন্দ! তাহাদের প্রণয়ের জীবন্ত নিদর্শন পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু একি, অতুলচন্দ্রের বুক ধন

ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, কি যেন একটা অপ্রত্যাশিত বেদনা তাহার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া দিল! অন্তর শিহরিয়া উঠিল, সে একটা দারুণ বেদনা মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল! হায়, বাহ্যস্মৃতির লুপ্তপাপ অন্তরের অতি নিভৃতে আঘাত করিতেছিল, হতভাগ্য তাহার বেদনা অনুভব করিল কিন্তু প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

নানাকার্য্যের গোলযোগে অতুলচন্দ্র ছয় মাসের মধ্যে কলিকাতায় যাইবার সুযোগ করিতে পারিল না। কিন্তু এ কয়মাস তাহার প্রাণ কলিকাতাতেই পড়িয়া রহিল।

আজ অতুলচন্দ্র কলিকাতায় যাইতেছে, প্রাণে কত আশা, কত সাধ। আজ তাহার প্রাণময়ী অরুণার কোলে তাহার সন্তান দেখিবে! ট্রেণ যেন চলে না। প্রত্যেক ষ্টেশনে দু এক মিনিট দেরী অসহ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

দরজায় গাড়ী হইতে নামিয়াই গাড়ীবারান্দায় সন্তান-ক্রোড়ে অরুণাকে দেখিতে পাইল। কি সুন্দর কুঞ্চিত কেশমণ্ডিত পুষ্পবর্ণ সুকোমল গঠন। শিশু সন্তান-ক্রোড়ে অরুণা, যেন মুকুল ও ফুলের অপূর্ব্বসম্মিলন।

অতুলচন্দ্র সন্তান লইবার জন্য সাগ্রহে হস্ত বিস্তার করিল, কিন্তু একি! সন্তানের ঠিক সম্মুখে অসম্পূর্ণ গঠন এক ছায়া-শিশু তাহার ক্রোড়ে আসিবার জন্য ক্ষীণহস্ত বিস্তার করিতেছে।

ভীতভাবে অতুলচন্দ্র দুই পা পিছাইয়া গেল। স্বামীর হঠাৎ এ ভাবের কারণ অরুণা কিছুই বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত হইয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। ভাল করিয়া অতুলচন্দ্র চক্ষু মুছিয়া আবার সন্তান লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল, হায়! এবারও তাই; সেই ছায়া-শিশু অতুলের সন্তানকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। চীৎকার করিয়া অতুলচন্দ্র বারান্দার সিঁড়ির উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সংসারের মোহ-আবরণে পাপের দাহস্মৃতি মানুষে অনেক সময় অনুভব করে না বটে, কিন্তু কোন্ মুহূর্ত্তে কখন সেই মহাপাপের আগ্নেয় স্মৃতি প্রজ্বলিত হইয়া হৃদয় মন দগ্ধ করিবে মানুষ তাহা জানে না, তাই পাপ এত ভয়ানক, তাই পাপে এত ভয়।

সকলে ধরাধরি করিয়া মূর্চ্ছিত অতুলচন্দ্রকে শয়নকক্ষে লইয়া গেল। অনেক ডাক্তার আসিল, কিন্তু কেহই রোগ-নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া অতুলচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রিতে ক্রমশঃই প্রলাপ বাড়িতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া অতুলচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠে, অরুণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতুলচন্দ্রের বক্ষ ভাসাইতে লাগিল।

বিভীষিকা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। ভোর রাত্রে

অতুলচন্দ্র অতি করুণস্বরে সম্মুখের দিকে চাহিয়া কাহাকে যেন লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—

"সরে যা, সরে যা, খোকাকে আমার কোলে নিতে দে, হয়ে অবধি আমি ওকে একবারও কোলে নিইনি। মহাপাপ করেছি, ক্ষমা কর, আমি ত তোর বাপ। একবার খোকাকে আমায় কোলে নিতে দে।"

অতুলের প্রলাপবাক্যে অরুণার প্রথম জীবনের মহা-পাপের ভীষণ স্মৃতি মুহূর্ত্তে স্মরণপথে উদিত হইল, সেও সে বিভীষিকা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল। কাঁপিতে কাঁপিতে অরুণা অস্ফুট চীৎকার করিয়া অতুলচন্দ্রের বুকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

বেদের মেয়ে

মতিয়া বেদের মেয়ে, কিন্তু বেদের মেয়ে হলে কি হয়, রূপ তার রাজার মেয়ের মত, টানা টানা ডাগর ডাগর ভাসা ভাসা চোক, গায়ের রংও খুব ফরসা, হাতপাগুলি গোলগাল, কোমরটী সরু, তার চলিবার ভঙ্গিটী আরও সুন্দর। বয়স পনের ষোল বৎসর।

তার পূর্ব্বপুরুষের বাস বোধ হয় ইস্‌পাহানের কাছাকাছি কোথায় ছিল, এখন তাহারা বাঙ্গালারই অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের নিজস্ব একটা ছেঁড়া তাঁবু, দুখানি খাটিয়া, গুটী চারি পাঁচ ছাগল, তিনটি মুরগী, আর একটী বেতো ঘোড়া। ঘোড়াটী তাঁবুর আসে পাশে মাঠে চরিয়া খাইত, সন্ধ্যার সময় ছেঁড়া তাঁবুটীর সম্মুখে আসিয়া চিঁহি করিয়া তাহার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিত। মতিয়ার মা কি বাবা একদিন একটু মোটা রুটীর টুকরা, একদিন বা একমুঠা চানা দিত, তাহাতেই এই শান্ত পশুটী আনন্দের সহিত মাথা নাড়িয়া হর্ষে হ্রেষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। মতিয়ার মা, বাবা ও একটী ছোট ভাই ছিল, সকলেই তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র তাঁবুটীর মধ্যে, ঝড়, জলবর্ষা, শীত গ্রীষ্ম পরম শান্তিতে বসবাস করিয়া আসিতেছিল।

রাত্রে ছাগল কয়টী খাটিয়ার নীচে আশ্রয় লইত, মুরগী কয়টী খাটিয়ার উপরে তাহাদের শিয়রে বসিয়া নিশি যাপন করিত। প্রভাতে মুরগী ডাকিয়া উঠিত, মুরগীর স্বরে ছাগল কয়টীরও ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, তাহারা মৃদু মৃদু ডাকিয়া সকলের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিত।

মতিয়া খুব বাল্যকাল হইতেই এই তাঁবুটীর আশ্রয়ে নগর হইতে নগরান্তরে পিতা মাতার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের বসবাস এক স্থানে ছিল না, দুই তিন মাস কোন একটা গ্রামের ধারে মাঠে তাঁবু গাড়িয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে নানা রকমের ছুরী, কাঁচি, বড় বড় ঢাকা, খেজুর পাতার বিচিত্র-বর্ণের ডালা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দিন যাপন করিত।

সেবার ইস্‌লামপুরের নিকটে গ্রামের বাহিরে তাহারা তাঁবু গাড়িয়াছিল এবং অনেক দিন ধরিয়া বসবাস করিতেছিল। গ্রামখানিতে অধিকাংশই মুসলমানের বাস। অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান বাস করে, সকলেই চাষবাস করিয়া খায়, সকলেরই ঘরে ধানের গোলা, পেটের ভাত সকলেরই আছে, নাই অর্থের সচ্ছলতা! তথাপি তাহারা সুখী, সকাল বেলা চাল নাই শুনিয়া হাঁ করিয়া বসিতে হয় না!

ইস্‌মাইল আমির মণ্ডলের পুত্র, আমির মণ্ডল খুব বড় চাষী, হাজার বিঘা জমি চাষ করে, বাড়ীতে দশ বারখানি বড় বড়

টিনের ঘর, এক পাল গরু, ধানের দাদনের কারবার। আমির মণ্ডলের দুইটী স্ত্রী অপুত্রক মরিয়া যাইবার পর তৃতীয়পত্নীর গর্ভে ইস্‌মাইলের জন্ম, তাহার আদরের সীমা নাই। ইস্‌মাইলের বয়স এখন উনিশ কুড়ি। সুস্থ সবল সুন্দরকান্তি, লোকও সে খুব ভাল। ইস্‌মাইল বংশীবাদনে সিদ্ধহস্ত, তেলে-পাকা বাঁশের বাঁশীটি সদাই তাহার কাছে থাকিত।

গ্রামের ধারে নদী, জল খুব পরিষ্কার, নীচের বালি অবধি দেখা যায়, নদীর মধ্যে বড় বড় বাঁশের মাচা বাঁধিয়া জেলেরা মাছ ধরিবার উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় ইস্‌মাইল নদীর সেই নির্জ্জন সৈকতে জেলেদের বাঁশের মাচায় বসিয়া বাঁশী বাজাইত, দিগন্ত ব্যাপিয়া সেই স্বর-লহরী যেন তটিনীতরঙ্গে মিশিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইত।

ইস্‌মাইল বাঁশী বাজাইতেছিল, শ্যামাঙ্গিনী রমণীর সুবর্ণ অঞ্চলখানির মত নদীর তীরবর্ত্তী ঈষৎ পক্ক ধান্যগুচ্ছসকল হাওয়ার তরঙ্গে লুটাইয়া পড়িতেছিল, অস্তমিত সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত মেঘরাশি চন্দ্রাতপের মত পশ্চিম আকাশে, শ্যামল প্রান্তরের উপর উড়িতেছিল। মতিয়া সেই পথ দিয়া আসিতেছিল, বাঁশির স্বরে থমকিয়া দাড়াইল; কি মর্ম্মস্পর্শী হৃদয়ের তান, অঙ্গুলিসঞ্চালনে উচ্ছসিত আকুল আহ্বানের মত নদীতীর কম্পিত করিয়া হাওয়ার তালে দুলিয়া দুলিয়া আকুলি বিকুলি করিয়া বাঁশী

কাঁদিতেছিল। ব্যাধের বংশীসুর-মুগ্ধা হরিণীর মত মতিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্‌মাইল মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, নির্জ্জন নদীসৈকতে সুবর্ণ-দেউলের পার্শ্বে স্বর্গের পরীর মত কে দাঁড়াইয়া! হাওয়ায় ঘাগরা কাঁপিতেছিল, মাথায় বিচিত্রবর্ণের রুমাল বাঁধা, চোকে সুরমা, সুলম্বিত বেণী, ইস্‌মাইল আর চোক ফিরাইতে পারিল না। হাতের বাঁশী হাতে রহিল, চোখে আর পলক পড়িল না। যুবতী নিকটে অগ্রসর হইল, সেই সন্ধ্যার রক্তিমচ্ছায়ার মধ্যে মুখরা তরঙ্গিণীর গীতলহরে উভয়ে উভয়ের সহিত পরিচিত হইল, কত দিনের আকাঙ্ক্ষিত চিত্ত, কত দিনের পরিচয়, কিসের আবর্ত্তে কতদূরে গিয়া পড়িয়াছিল, আজ যেন কোন শুভ মুহূর্ত্তে দুজনের সহিত দুজনের সাক্ষাৎ। দুজনের আত্মার সহিত দুই জনে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ অনুভব করিল।

(২)

প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আকুলি বিকুলি করিয়া বাঁশী বাজে, নদী-তরঙ্গ চঞ্চল হয়, শস্যক্ষেত্র কাঁপিয়া উঠে, কেশের ঝোপের মধ্য হইতে মনিয়ার দল ঝঙ্কার দেয়, গ্রামের প্রান্তরে বটবৃক্ষ হইতে 'বউ কথা কও' পাখিটী ডাকিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে পাপিয়া পিঁ

কাঁহা করিয়া মতিয়ার ছেঁড়া তাঁবুটীর মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যায়, মতিয়া আর ঘরে থাকিতে পারে না, ছুটিয়া চলে, বন্ধুর পথে পা কাটিয়া যায়, কাঁটা গাছে ঘাগরা টানিয়া ধরে, কুশের কাঁটা পায়ে বেঁধে, চোরা কাঁটায় অঙ্গ ভরিয়া যায়, সে দিকে লক্ষ্য নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রতি মুহূর্ত্ত কত মূল্যবান্, জীবনের সার্থক মুহূর্ত্ত; মিলনাকাঙ্ক্ষিতা নারী সকল ভুলিয়া ছুটিয়া চলে। বাঁশী কত রকমের সুর তুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকে, সে বাঁশী কথা কয়, তার সুরে মতিয়ার প্রাণের সুর বাঁধা। এমনি আবেগে স্বপনে দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল।

লোকগঞ্জনা আর সয় না, একদিন নিশীথে উভয়ে পলাইয়া এ লোকগঞ্জনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। পুত্রের এই ব্যবহারে আমির মণ্ডল তাহার সমস্ত জোত জমি পীরের দরগায় লিখিয়া পড়িয়া দিয়া স্ত্রীপুরুষে মক্কায় চলিয়া গেল। বৃদ্ধ বেদে বেদেনী দিনকতক কান্নাকাটি করিল, তাহার পর যেমন করিয়া তাহাদের দিন চলিত আবার তেমনি করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল, কন্যার অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু মতিয়ার সন্ধান পাওয়া গেল না।

মতিয়াকে লইয়া ইস্মাইল সহরে সহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, উভয়ের বিবাহ হইয়াছে। ইস্মাইল বাঁশী বাজায়, মতিয়া গান করে। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ

হয়, সন্ধ্যার সময় মতিয়া রুটী স্যাঁকে, ইস্‌মাইল বসিয়া বসিয়া বাঁশী বাজায়, বাঁশী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা মতিয়া তরকারিতে নুন দিতে ভুলিয়া যায়, রুটী স্যাঁকিতে পুড়াইয়া ফেলে, তাহাতেই কত আনন্দ তাহাতেই কত সুখ।

বেশ সুখে সচ্ছন্দেই দিন কাটিতে ছিল! কিন্তু ইস্‌মাইলের বাঁশীই তাহার কাল হইল। পল্লীর এক মুসলমান-বালিকাকে ইস্‌মাইলের বাঁশী পাগল করিল। বালিকারও রূপ ছিল, দুর্ভাগা ইস্‌মাইল মুগ্ধ হইয়া পড়িল। হায় মোহ! তুমি প্রেমের নামে কত লোকের ইহকাল পরকাল নষ্ট কর, হৃদয়ে নরকাগ্নি জ্বালিয়া দাও, তথাপি তোমার এমনি মোহিনী রূপ, মানুষ তোমাকে সহজে চিনিতে পারে না। রাক্ষসীকে রাজকন্যা ভ্রমে বুকে ধরে, একদিন নিশীথে দুর্ভাগিণী মতিয়াকে একাকিনী ফেলিয়া ইস্‌মাইল বালিকাকে লইয়া পলায়ন করিল।

ইরানের উষ্ণ রক্ত মতিয়ার দেহে বর্ত্তমান। সে দারুণ উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিল না, তাহার জাতীয় অস্ত্র বাঁকাল ছুরী, সযত্নে বক্ষোমধ্যে লইয়া এই দারুণ অবিশ্বস্ততার প্রতিশোধের জন্য নগর হইতে নগরান্তরে অগ্নিশিখার মত ইস্‌মাইলের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

(৩)

পুনাসহরের বাজারের ধারে ইস্‌মাইল বাঁশী বাজাইতেছে। মুসলমানবালিকা গান করিতেছে। লোকের ভারি ভিড়, বিচিত্র সুরে দুলিয়া দুলিয়া ইস্‌মাইলের বাঁশী বাজিতেছিল। ঝড়ের মত এক যুবতী বেদেনী ঝক্ ঝকে সুতীক্ষ্ণ ছুরিখানি ইস্‌মাইলের বক্ষে বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। মুহূর্ত্তে পার্শ্ববর্ত্তী লোকের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যুবতী দলিতা ফণিনীর মত গর্জ্জিতে লাগিল। ইস্‌মাইল আত্মরক্ষার্থে পিছনে হটিতে পড়িয়া গেল। যুবতীর চক্ষু দিয়া অগ্নি বাহির হইতেছিল। পুলিশ তখনি রমণীকে হাজতে লইয়া গেল। বিচারে বেদেনী যুবতীর তিন মাস মেয়াদ হইল।

এই ঘটনার পর হইতেই ইস্‌মাইল কেমন একটা অনুশোচনা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার বাঁশী আর সুরে বলে না—বেসুরে বলিতে থাকে, রাগিণী আসে না, লোকে শুনিলে বিরক্ত হয়। পয়সাও তেমন রোজগার হয় না। সঙ্গিনী যুবতীও ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল, এ বিরক্তি ইস্‌মাইলও বেশ অনুভব করিল। ইস্‌মাইলের মুখে আর হাসি নাই। শান্তসৈকতে সান্ধ্য-ছায়ায় বাঁশীর সেই সুরলহরী, মতিয়ার সেই ছল ছল ফুল্ল-নেত্র, সেই আলিঙ্গনের আকুল পিপাসা, সেই নিশীথে গৃহত্যাগ,

সেই গ্রামের মধুর স্বপ্ন, সেই জনারের রুটী, সব একে একে ইস্‌মাইলের মনে পড়ে। সেই প্রেমময়ী বালিকার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার, সরল অন্তরে শেলের আঘাত ইস্‌মাইলের বুক চুরমার করিয়া দেয়, দিবারাত্রি বসিয়া কাঁদে, গভীর অনুশোচনায় মনোভঙ্গে—ইস্‌মাইলের দারুণ শিরঃপীড়া হইল, সেই শিরঃপীড়া হইতে চক্ষের অসুখ দেখা দিল।

কঠিন পীড়া, চক্ষের অসহনীয় যন্ত্রণা, চোক দিয়া অনবরত জল পড়ে, ঝাপ্‌সা দেখে, চক্ষের বর্ণ লাল, সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা।

জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন, অসহনীয় উত্তাপ, ধরণী ফাটিয়া চৌচির হইতেছে। পাখীর ডাক থামিয়া গিয়াছে, কাকও ডাকে না। এক খানি জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া ইস্‌মাইল ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, নিকটে কেহই নাই, উঠিবার সামর্থ্য নাই, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, চক্ষে ও মাথায় প্রবল যন্ত্রণা। ইস্‌মাইল ব্যাকুলভাবে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, মৈনী—কেহই উত্তর দিল না। তাহার সঙ্গিনী কৃষকবালা মৈনী তাহাকে তাহার অসময়ে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল "মতিয়া' ক্রমশ কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতে লাগিল।

দেহের ভিতর অগ্নিবর্ষণ হইতেছিল, তাহার মস্তক ঘুরিতে-ছিল, মনে হইল তাহার মৃত্যু সন্নিকট। মৃত্যুসময়ে একবার মতিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, এক বার তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলা হইল না, আমি বড় ভুল করিয়াছি, আপনার জন ভুলিয়া পরকে আপনা করিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। হায়! আজ সে আমি কতদূরে;—ইস্‌মাইল প্রবল আবেগে তাহার সেই সুখের স্মৃতিপূর্ণ বাঁশের বাঁশীটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল, তাহার পর তাহার আর কোন সংজ্ঞা রহিল না।

(৪)

মতিয়া জেল হইতে খালাস হইয়া তাহার পিতামাতার নিকটে আসিয়াছে, সে এখন পিতামাতার সহিতই বাস করে। মতিয়ার যে চক্ষু দেখিলে মোহমুগ্ধ যুবকেরা পাগল হইত, এখন সেই চক্ষু দেখিলে তাহাদের ভয় হয়, অস-চ্চরিত্র যুবকেরা তাহার নিকটে আসিতে সাহস করে না! পিতামাতাই ভিক্ষা করিয়া আনে, সে বাহিরে কোথাও যায় না। ঘরে বসিয়া ছোট ছোট ডালা বোনে আর প্রত্যহ বক্ষ মধ্য হইতে ছুরীখানি বাহির করিয়া তাহাতে ধার

দেয়। সে ইস্মাইলের বক্ষরক্তের জন্য ব্যাকুল, সে তাহার বক্ষের অগ্নি ইস্মাইলের তপ্ত রক্তে শীতল করিবে। ছুরী ধার দিতে দিতে অন্তর্নিহিত প্রতিহিংসা জ্বলিয়া উঠে, চোক দিয়া আগুন বাহির হয়, মুখে একটা পৈশাচিক দীপ্তি খেলা করে। সে দৃষ্টি রক্তলোলুপ হিংস্র জন্তুর দৃষ্টি অপেক্ষা ভয়াবহ।

দুই বৎসর পর ইস্মাইল একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাহাদের পবিত্র মিলনক্ষেত্র গ্রামের নদীসৈকতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শীতল পবিত্র বায়ুতে যেন তাহার বুকের ভার অনেকটা পাতলা হইয়া গেল, তরঙ্গিণীর সুর তাহাকে মোহিত করিয়া দিল, সে অনেক দিনের পর নদীসৈকতে বসিয়া আবার বাঁশী বাজাইতে লাগিল। বাঁশী আজ আর বেসুর বেতালা বলিল না, কূলপ্লাবিত করিয়া করুণরোল তুলিয়া ছুটিয়া চলিল। করুণায় তরঙ্গিণীর তরঙ্গ উদ্বেলিত বক্ষে কূলে পড়িয়া মাথা ঠুকিয়া ইস্মাইলের হৃদয়-বেদনার সহানুভূতি করিতে লাগিল। সে রোলে দিক্‌পূর্ণ হইয়া গেল, আকাশে মর্ত্ত্যে একটা করুণ উচ্ছ্বাস বাজিয়া উঠিতে লাগিল!

স্বপ্নের আবেশের মত একটা সুর মতিয়ার কর্ণের ভিতর দিয়া বক্ষের ভিতরে মৃদুমন্দ আঘাত করিতে লাগিল, হাতের

ডালি হাতেই রহিল, তাহার আর বোনা হইল না, সে উৎকর্ণ হইয়া বংশীস্বর শুনিতে লাগিল। শান্ত শীতল প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ুমথিত বংশীস্বর, স্নিগ্ধোজ্জ্বল সন্ধ্যায় বংশীর আকুল আহ্বান তাহার মনে পড়িল, এ বাঁশীর সুর মতিয়ার চেনা, সে লাফাইয়া উঠিল, বক্ষের ছুরীখানি বাহির করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিল, সে হাসিতে উপক্ষিতা নারীর হৃদয়ের সব প্রতিহিংসা এক সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল, ছুরীকাও সঙ্গে সঙ্গে ঝক্ ঝক্ করিয়া হাসিল। তারপর মতিয়া উন্মাদিনীর মত নদীতীরে ছুটিয়া চলিল।

(৫)

ইস্‌মাইল জেলের মাচার উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া বাঁশী বাজাইতেছে, পায়ের নীচে নদীর জল তালে তালে নাচিতেছে, শ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর অস্তমিত সূর্য্যকিরণ ঝক্ ঝক্ করিয়া হাসিতেছে, আকাশ বিচিত্র বর্ণময়ী, মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে স্রোতের আঘাতে নদীর মধ্যস্থিত একটা লম্বা পোতা বাঁশ অল্প অল্প কাঁপিতেছিল, তাহারই মাথায় একটা কাল ফিঙ্গা তাহার মৎস্য-পুচ্ছ নাড়িয়া নাড়িয়া ইস্‌মাইলের সুরে চকিতদৃষ্টিতে ভীতভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিল, কিন্তু উড়িবার সামর্থ্য ছিল না! এমনি সুরের মোহময়ী শক্তি! খরশলা মাছের দল মাচার আশে

পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের রজতকান্তির ঔজ্জ্বল্য কালজলের মধ্যেও চক্ চক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। দূরে একটা চিল মাচার বংশদণ্ডের উপর বসিয়া মৎস্যশিকারের লালসায় নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, বুভুক্ষু পক্ষীর আর শিকার করা হইল না, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া বাঁশির সুর শুনিতে লাগিল। তীরে একটা গাভীরও এই দশা হইল, সে নধর দূর্ব্বার লোভ পরিহার করিয়া ঘাড় তুলিয়া মুগ্ধভাবে বাঁশীর দিকে চাহিয়া রহিল, পাড়ের কাটালের মধ্য হইতে একটা বিষাক্ত সর্প মুখ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া বাঁশীর তালে তালে দুলিতেছিল।

বাঁশী বাজিতেছে. কি করুণা, কি বেদনা, কি উচ্ছ্বাস, হৃদ্-তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়, চক্ষের জল আপনি পড়ে, মতিয়াও নদীতীরে দাঁড়াইয়া চক্ষের জল মুছিল, তাহার হৃদয় একটা করুণায় ভরিয়া গেল। কতক্ষণ এ অবস্থায় গেল, তাহা সে জানে না, হঠাৎ তাহার মনে হইল "প্রতিশোধ" মুহূর্ত্তে সে ছুরিকা বাহির করিয়া ইস্মাইলের বক্ষরক্তের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু কৈ উত্থিত ছুরিকা, ইস্মাইলের বক্ষ বিদ্ধের জন্য উন্মুখ? ইস্মাইলের সে দিকে দৃষ্টি নাই, মতিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, বাঁশী তেমনই করুণ কোমল সুরে বাজিতেছিল। মতিয়া ছুরিকা ইস্মাইলের চক্ষের সম্মুখে ধরিল, তাহার নেত্র পলকহীন, একটী কম্পনও মতিয়া অনুভব করিল না। বিস্মিত হইয়া মতিয়া

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হায়! ইস্‌মাইলের দুইটী চক্ষুই চির-দিনের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই করুণ দৃশ্যে একটা গভীর সহানুভূতির করুণ রোলে তাহার সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিল, তাহার হাতে ছুরী খসিয়া পড়িল। হায় নারী! এইখানেই তোমার দুর্ব্বলতা, এইখানেই তোমার দেবীত্ব, এইখানেই তুমি মহিমাময়ী, এইখানেই তোমার সার্থকতা। মতিয়া পরিপূর্ণ আবেগে ডাকিল,—ইস্‌মাইল। স্বপ্নোত্থিতের মত চমকিত হইয়া ইস্‌মাইল ডাকিল,—মতিয়া। দৃঢ়ালিঙ্গনে মতিয়া ইস্‌মাইলের কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিল, ইস্‌মাইলের অন্ধ চক্ষের মন্দাকিনী ধারা মতিয়াকে সিক্ত করিয়া দিল।

পিতার প্রায়শ্চিত্ত
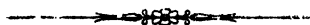
উপত্যকাবাহিনী নির্ঝরিণী উপলখণ্ড চুম্বন করিতে করিতে রজতরেখার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্ব্বতনিম্নে পড়িতেছিল। সফেন জলরাশির উপর চন্দ্রকিরণ ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

একখানি উচ্চ উপলখণ্ডের উপর একটি যুবতী এক যুবকের কণ্ঠদেশ দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাহার প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। যুবকও অনিমিষ লোচনে যুবতীর অপরূপ রূপ-রাশি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। উভয়েই নির্ব্বাক্, উভয়েই উভয়ের রূপে আত্মহারা।

যুবতীর সুগঠিত পদনিম্ন দিয়া রজতপ্রবাহ ফেনময় কলহাস্য-তরঙ্গে গভীর আবেগে প্রিয়সমাগম-উন্মুখী। মূর্খ উপলখণ্ড হৃদয় দিয়া তাহা রোধ করিতে চায়। সে কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় আলোকসম্পদে বিদ্যুৎগর্জ্জনে প্রেমসিন্ধু-অভিমুখে ধাবিত—তাহার গতিরোধের শক্তি কার? সে গভীর আবেগে পাষাণ-অবরোধ লঙ্ঘনে জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়া আকাঙ্ক্ষিত পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। সে আগ্রহ, সে উল্লাস, সে গতির বিরাম নাই, বাধার প্রতি লক্ষ্য নাই, অবিরাম অপ্রতিহত গতি। এ দুইটি হৃদয়ও তেমনি মিলনাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ। রজততরঙ্গিণীর

মত শত সহস্র বাধার মধ্যেও প্রেমের অনন্ত পারাবারের, অটল বিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা যাত্রী।

যুবতীর নাম অক্টেভিয়া। তাহার পিতা একজন বিখ্যাত ধনী এবং উচ্চবংশসম্ভূত। যুবকের নাম মেগ্রিগর; সে দরিদ্র একজন নগণ্য সৈনিক।

অক্টেভিয়া মেগ্রিগরকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, কিন্তু তাহার পিতা তাহাতে রুষ্ট। তাঁহার ইচ্ছা কারণেন্‌ডার নামক এক ধনী যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ হয়। অক্টেভিয়া তাহাতে নিতান্ত অসম্মত। কারণেন্‌ডারও তাহা জানে। কিন্তু রূপমুগ্ধ যুবক অক্টেভিয়ার আশা পরিত্যাগ করিতে পারিল না। আমরা কারণেন্‌ডারের দোষ দিতে পারি না। এ জগতে সৌন্দর্য্যমুগ্ধ নয় কে? অক্টেভিয়ার অপরূপ রূপ তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছিল।

অক্টেভিয়ার পিতা দেখিলেন, কন্যা কিছুতেই মেগ্রিগরকে ভুলিতে পারিতেছে না, তাঁহার যত রাগ মেগ্রিগরের উপর পড়িল। সৈনিকবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অক্টেভিয়ার পিতার অনুরোধে মেগ্রিগর তাহার উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের দ্বারা নানারূপে উৎপীড়িত হইতে লাগিল! শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, কর্ম্ম করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল! মেগ্রিগর চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু অক্‌টেভিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। আইনে অবশ্যম্ভাবী প্রাণদণ্ড জানিয়াও সে নগরপ্রান্তে পর্ব্বতগহ্বরে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিল। অক্‌টেভিয়া প্রত্যহ তথায় তাহার আহার্য্য লইয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিত। এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। অক্‌টেভিয়ার পিতা তথাপি সন্তুষ্ট হইলেন না; তাঁহার প্ররোচনায় মেগ্রিগরকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পারিতোষিক ঘোষিত হইল।

অক্‌টেভিয়া সে দিনও সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। হঠাৎ চাহিয়া দেখিল, দূরে উপলখণ্ডের ভিতর হইতে কে একজন লোক তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহই নাই; কিন্তু তাহার মনে একটা খট্‌কা রহিয়া গেল।

সেই অস্পষ্ট মূর্ত্তি ক্ষীণচন্দ্রালোকে তাহার নিকট কার্ণেগুারের মত বোধ হইয়াছিল। অক্‌টেভিয়া মেগ্রিগরকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া রাত্রির জন্য বিদায় লইল। লঘুপদা হরিণীর মত এক উপলখণ্ড হইতে অন্য উপলখণ্ডে লাফাইয়া লাফাইয়া অক্‌টেভিয়া নীচে নামিতে লাগিল, মেগ্রিগর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

(২)

পর দিন যখন সেনানিবাসের পথ দিয়া অক্‌টেভিয়া যাইতে-ছিল, তখন সে দেখিতে পাইল, কার্ণেণ্ডার সেনানিবাসের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। অক্টেভিয়া একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। মেগ্রিগরের গ্রেপ্তারের কতদূর কি হইতেছে, সংবাদসংগ্রহের জন্য অক্টেভিয়া প্রায়ই নানা অছিলায় সেই পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। কার্ণেণ্ডারকেই যে কল্যরাত্রে উপলখণ্ডের অন্তরালে দেখিয়াছিল, সে বিষয়ে আর তাহার কোন সন্দেহ রহিল না। অক্টেভিয়া মেগ্রিগরকে এই সংবাদ দিবার জন্য উপত্যকাভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে অক্টেভিয়া মেগ্রিগরকে বলিল—"তুমি শীঘ্র পলাও, কার্ণেণ্ডার তোমার সংবাদ ছাউনীতে দিয়াছে; এখনি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিবে।" ম্লান দৃষ্টিতে মেগ্রিগর অক্‌টেভিয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করা অপেক্ষা আমার মৃত্যু অধিক প্রার্থনীয়।"

অক্‌টেভিয়ার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল। সে অনেক কষ্টে তাহা নিবারণ করিয়া কম্পিত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—"তুমি পলায়ন কর, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যদি তুমি জীবিত থাক, আমি নিশ্চিত তোমার সহিত মিলিত হইব।"

প্রবল আগ্রহে মেগ্রিগর অক্‌টেভিয়াকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। উভয়ে তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। হঠাৎ একখানি স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের পতনশব্দে চমকিত হইয়া তাহারা চাহিয়া দেখিল, পর্ব্বতনিম্ন হইতে সৈনিকগণ উপরে উঠিতেছে, সঙ্গে কার্ণেণ্ডার, আর সময় নাই, নিম্নের সৈনিকগণ এখনি উপরে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া অক্‌টেভিয়া বলিল,—"পালাও পালাও।" মেগ্রিগর চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, সৈনিকগণ উপরে উঠিতেছে। সে অক্‌টেভিয়ার হাতদুটি ধরিয়া আবেগ-ভরে মুখচুম্বন করিল। সে চুম্বনে কত আগ্রহ, কত ব্যাকুলতা, হয় ত এই চুম্বন তাহাদের জীবনের শেষ চুম্বন। হয় ত ইহাই জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত, জীবনের শুভক্ষণ, জীবনমরণের সন্ধিস্থলে এই মহামিলন কত পবিত্র, কত মধুর !!

চঞ্চলভাবে ভীতকণ্ঠে অক্‌টেভিয়া আবার বলিল,—"দেরী করো না, পালাও পালাও, ঐ ওরা এল।" মেগ্রিগর এই আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া গিয়াছিল। সে একটা মোহময়ী আবেশে সংজ্ঞাশূন্য,—সে পলকবিহীন নেত্রে অক্‌টেভিয়ার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। অক্‌টেভিয়া গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল,—"দেখ্‌ছ কি, পালাও।"

নিদ্রোত্থিতের মত চমকিত হইয়া মেগ্রিগর চাহিয়া

দেখিল, সৈনিকেরা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, আর পলায়নের উপায় নাই। পার্শ্বে ঢালু পর্ব্বত, নিম্নে বিপুল স্রোতস্বতী। আর চিন্তার অবসর নাই। মেগ্রিগর ঢালুপথে অমানুষিক সাহসে গড়াইয়া গড়াইয়া নামিতে লাগিল। ভীত বিস্মিত নেত্রে উদ্বেলিত চিত্তে অকৃটেভিয়া পর্ব্বতনিম্নে চাহিয়া রহিল।

সে সাংঘাতিক মুহূর্ত্ত কি উদ্বেগপূর্ণ! একটি মুহূর্ত্তের উপর জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, সমস্ত সফলতা নির্ভর করিতেছে। হঠাৎ অকৃটেভিয়ার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, "ভগবন্!" আনন্দের একটা ক্ষীণ প্রভায় চকিতের মত তাহার সমস্ত বদন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অকৃটেভিয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া পর্ব্বতের গোপনপথে অদৃশ্য হইল।

পরক্ষণেই সৈনিক সমভিব্যাহারে কার্ণেগুার সেইখানে আসিয়া দেখিল, পাখী উড়িয়াছে। সেও উন্মত্তের মত সেই ঢালুপথ দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া নীচে নামিতে লাগিল। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার হিতাহিতজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল।

(৩)

নীচেই নদী, তাহাতে প্রবল স্রোতঃ; দাঁড়াইয়া থাকা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। মেগ্রিগর নদীর স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। সে অসাধারণ সন্তরণপটু। পশ্চাৎ পশ্চাৎ

কার্ণেগুারও নদীতে লাফাইয়া পড়িল। মেগ্রিগর তখন অনেক দূর গিয়াছে। কার্ণেগুার প্রবল স্রোতে অগ্রসর হইতে পারিল না। সে পূর্ব্বেই পর্ব্বতে দ্রুত উঠিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার প্রবল স্রোতে ক্রমশঃই সে বলহীন হইয়া পড়িতে লাগিল।

নদীর মাঝামাঝি যাইয়া কার্ণেগুারের অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল; তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষুর দীপ্তি নিভিয়া আসিতে লাগিল। আর মুহূর্ত্তমধ্যে সে নিঃসন্দেহ অতলজলে তলাইয়া যাইবে। প্রাণভয়ে কার্ণেগুার ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিয়া বলিল,—"কে আছ, রক্ষা কর"।

মেগ্রিগর তখন অনেক দুরে চলিয়া গিয়াছে। কূলপ্রাপ্তির আর বিলম্ব নাই। ধবল বালুকারাশি দেখা যাইতেছে, এমন সময় তাহার কাণে গেল "কে আছ, রক্ষা কর"। সে ফিরিয়া দেখিল, বহুদুরে মগ্নপ্রায় অস্পষ্ট কার্ণেগুার ব্যাকুল ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে।

আর্ত্তের আকুল আহ্বানে মেগ্রিগরের আর কূলে উঠা হইল না, সে নিজের বিপদের কথা ভুলিয়া গেল! শত্রুতা ভুলিয়া গেল! সে কার্ণেগুারের উদ্ধারের জন্য পুনরায় ফিরিয়া চলিল, মেগ্রিগর নিকটে গিয়া দেখিল, কার্ণেগুার জীবনরক্ষার জন্য আকুলভাবে হাত পা ছুঁড়িতেছে। কিন্তু

সে ভীষণ তরঙ্গাঘাত রোধ করিতে পারিতেছে না। এক একবার ডুবিয়া যাইয়া পুনরায় ভাসিয়া উঠিতেছে। মেগ্রিগর তাড়াতাড়ি তাহার হস্ত ধরিল!

কার্ণেণ্ডার মুহ্যমান অবস্থায় এই অবলম্বন পাইয়া দৃঢ়ভাবে মেগ্রিগরকে জড়াইয়া ধরিল। এমন অবস্থা হইল যে, দুই-জনেই বুঝি ডুবিয়া যায়। বহুকষ্টে পরিশ্রান্ত মেগ্রিগর কার্ণেণ্ডারের হস্ত ছাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"হাত ছাড়, অমন করিলে দুজনেই ডুবিব। আমার দেহে ভর দিয়া ভাসিয়া চল, আমি তোমাকে তীরে লইয়া যাই"। অনেক কষ্টে মেগ্রিগর কার্ণেণ্ডারকে লইয়া পর্ব্বতসন্নিভ কূলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তীরে সৈনিকেরা দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে-ছিল। শত্রুর প্রতিও এত দয়া! তাহারা মেগ্রিগরের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া গভীর আনন্দে সমস্বরে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

মেগ্রিগরের চেষ্টায় অনেক প্রকার প্রক্রিয়ার পর কার্ণেণ্ডার সংজ্ঞালাভ করিল। সে চক্ষু চাহিয়াই দেখিল, সম্মুখে মেগ্রিগর! মেগ্রিগর তাহার প্রাণদাতা, কিন্তু প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী—অক্টে-ভিয়া তাহাকে ভালবাসে। অক্টেভিয়ার সুন্দর মুখখানি রূপমুগ্ধ কার্ণেণ্ডারকে মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত করিল, সে কৃতজ্ঞতা

ভুলিয়া গেল। চীৎকার করিয়া সৈনিকগণকে বলিল,—"পলাতককে বন্দী কর"।

এই দারুণ অকৃতজ্ঞতায় অশিক্ষিত সৈনিকগণও ঘৃণায় মুখ ফিরাইল। অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহারা মেগ্রিগরকে বন্দী করিল।

আর্ত্তকে রক্ষা করিতে গিয়া বিচারে মহান্ হৃদয় মেগ্রিগরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। এই ভয়ঙ্কর আদেশ শ্রবণমাত্র অক্টেভিয়া ছিন্নমূল পুষ্পিত লতিকার মত সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

মেগ্রিগর প্রাণদণ্ডের আদেশে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সে বীরের মত স্থিরচিত্তে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু অক্টেভিয়ার এই কাতরতা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, বর্ম্মাবৃত প্রহরীর চক্ষুও অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠিল।

(৪)

কার্ণেণ্ডারের পিতা লর্ড ষ্টামফোর্ড অতি মহৎ প্রকৃতির ব্যক্তি। পুত্রের এই ভীষণ অকৃতজ্ঞতায় দেশব্যাপী কলঙ্কে তিনি হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইলেন। মেগ্রিগরের প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিবার পর মূর্চ্ছিতা অক্টেভিয়ার মলিন মুখখানি তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল; তিনি একটা দারুণ অস্বচ্ছ-

ন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন। পুত্র কার্ণেওয়ারের সে দিকে দৃষ্টি নাই, সে আনন্দে উন্মত্ত। পুত্রের এই অমানুষিক ব্যবহার পিতাকে আরও কাতর করিয়া তুলিল। তিনি স্থির করিলেন, পুত্রের এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি স্বয়ং করিবেন।

মেগ্রিগরের প্রাণদণ্ডের আদেশের পর হইতে অক্টেভিয়া কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদাই কি ভাবে, কাহারও সহিত কথা কয় না। কন্যার অবস্থা দেখিয়া পিতাও অনুতপ্ত। হায়, তিনিই কন্যার জীবনের সুখশান্তি নষ্ট করিয়াছেন।

অক্টেভিয়াদের বাড়ীর কিছু দূরে একটা বড় ওক গাছ ছিল, তাহার ঘন পত্রচ্ছায়ায় খান কয়েক বেঞ্চ পাতা থাকিত, সেই খানেই মেগ্রিগরের সহিত তাহার প্রথম প্রণয় হয়। উহা অক্টেভিয়ার বড় আদরের বড় প্রিয় স্থান। সেইখানে বসিয়া অক্টেভিয়া গালে হাত দিয়া কত কি ভাবিতেছিল, সে চিন্তার সীমা নাই, সংখ্যা নাই, বালিকার ক্ষুদ্রবক্ষে যে তরঙ্গ উঠিতেছিল, বুঝি ভীষণ বাত্যায় অত তরঙ্গ সমুদ্রবক্ষেও উঠে না। সুন্দর কেশরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, মুখ মৃতের মত ম্লান, চক্ষুপল্লব স্থূল ও সরস, দৃষ্টি উদাস, থাকিয়া থাকিয়া বক্ষ কম্পিত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছিল,

নিশ্চল স্থির শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত মূর্ত্তির মত সে বেঞ্চের উপর বসিয়াছিল। স্বচ্ছ আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘরাশি একত্র হইয়া ক্রমশঃ দিনকরজ্যোতি লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ধীরে ধীরে কার্ণেণ্ডারের পিতা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নিশ্চল দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার কথা বলিতে সাহস হইল না; অনেক ক্ষণ দাড়াইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—"মা!" স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির মত অর্থহীন দৃষ্টি করিয়া অক্টেভিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ বাঁধা দিয়া বলিলেন—"মা, শোন, আমি তোমাকে একটা গুরুতর কথা বলিতে আসিয়াছি।"

বালিকা নীরবে বৃদ্ধের মুখের প্রতি পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ বলিলেন,—"মা, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মেগ্রিগরের জন্য কি তুমি পিতামাতা আত্মীয় স্বজন সকলকে ত্যাগ করিতে পার?"

অক্টেভিয়া সব কথা বুঝিতে পারিল না, বৃদ্ধের সব কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই; কেবল মেগ্রিগরের নাম উচ্চারণে সে চঞ্চল হইয়া কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইল। বৃদ্ধ তাহা বুঝিলেন,—বলিলেন, "তুমি যদি পিতামাতার স্নেহ, স্বদেশের মায়া, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে লইয়া দেশত্যাগী

হইতে পার, তাহা হইলে মেগ্রিগরের জীবন রক্ষা হইতে পারে। যদি তুমি প্রস্তুত থাক বল, আমি সেইরূপ ব্যবস্থা করিব।"

উন্মাদিনীর মত প্রবল আগ্রহে অক্টেভিয়া বলিল, "আমার মেগ্রিগরকে আমাকে দিবেন।"

"বৃদ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "হাঁ দিব, কিন্তু তোমাকে দেশত্যাগ করিতে হইবে।"

অক্টেভিয়া বলিল, "আমার মেগ্রিগরের জন্য আমি কি না করিতে পারি! তাহার অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় কেহ নাই। তাহার জীবনের জন্য আমি সব করিতে পারি।"

বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুতে সিক্ত হইয়া আসিল। তিনি করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "মেগ্রিগরের প্রাণদণ্ডের দিন প্রাতঃকালে তুমি নদীকূলে উপস্থিত থাকিও। তোমাদিগের জন্য সেখানে একখানি নৌকা, তাহাতে একমাসের উপযোগী আহার্য্য, পাথেয় ও তোমাদের অবশিষ্ট জীবন যাহাতে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, তাহার উপযুক্ত অর্থ প্রস্তুত থাকিবে। মেগ্রিগর সেইখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র তোমরা নৌকা ভাসাইয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট দূরদেশে গিয়া বসবাস করিও।"

অশ্রুসিক্ত নয়নে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বৃদ্ধের হাত দুটি ধরিয়া অক্টেভিয়া পরম কৃতজ্ঞভাবে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন,

"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তোমাদের জীবন মধুময় হয়।" বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন।

(৫)

প্রাচীর-বেষ্টিত সেনানিবাসের মধ্যে একটি বড় বটগাছের ছায়ায় ফাঁসি মঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পার্শ্বেই কারা-প্রাচীর। একটি ডাল আসিয়া ফাঁসি মঞ্চের উপর পড়িয়াছে। তাহার অগ্রভাগে একটি শুষ্ক পত্র পতনোন্মুখ, ঠিক তাহারই কোল দিয়া আবার একটি নবীন পত্রের উন্মেষ হইতেছে। চতুর্দ্দিকে সৈনিকেরা বন্দুক লইয়া দণ্ডায়মান। বন্দী মেগ্রিগর প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলে সহাস্যবদনে সকলকে অভিবাদন করিয়া মেগ্রিগর নির্ভীকচিত্তে ফাঁসি মঞ্চে গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলে গভীর সম্মানের সহিত টুপি স্পর্শ করিল।

পুরোহিত শেষ প্রার্থনার জন্য বন্দীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও অল্প অল্প অন্ধকার আছে। তিনি মন্ত্র বলিবার ছলে মুখ ঈষৎ নত করিয়া বন্দীকে কি বলিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে একখানি ছুরী বাহির করিয়া বন্দীর হাতের বন্ধন কাটিয়া দিলেন। চক্ষের নিমেষে বন্দী বটবৃক্ষের ডাল ধরিয়া প্রাচীরের উপর লাফাইয়া উঠিল এবং পর মুহূর্ত্তেই সে প্রাচীরের পর পার্শ্বে লাফাইয়া পড়িল। সেখানে একটি লোক একটি তেজস্বী

বেগবান্ অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মেগ্রিগর অশ্বে লাফাইয়া উঠিয়া সজোরে কশাঘাত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

লিখিতে যতটা সময় গেল, কিন্তু কাজ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। প্রাচীর ঘুরিয়া বন্দীর অনুসরণ করিতে যে সময় গেল, তাহার মধ্যে বন্দী অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিল। কমাণ্ডার হুকুম দিলেন, বিশ্বাসঘাতক পাদরীকে গুলি কর। তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে ৫০.৬০টি বন্দুকের আওয়াজ হইল। ফাঁসি মঞ্চের উপর বৃদ্ধ পাদরী ঢলিয়া পড়িলেন।

ঠিক সেই সময়েই আর একজন পাদরী উপস্থিত হইলেন। বিস্মিত হইয়া সকলে চাহিয়া দেখিল, ইনিই তাহাদের নিয়োজিত পাদরী। তবে গুলি করা হইল কাহাকে? ফাঁসি-মঞ্চ হইতে পাদরীর মৃতদেহ নীচে লইয়া আসা হইল। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, পাদরীবেশে কার্ণেণ্ডায়ের পিতা বৃদ্ধ লর্ড ষ্টামফোর্ড! মহান্ হৃদয় বৃদ্ধ নিজের জীবনদানে পুত্রের ভয়ঙ্কর অকৃতজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

বউ মা

নবকিশোর স্মৃতিরত্ন অতি নিষ্ঠাবান্ সদাচারী ব্রাহ্মণ। বাড়ীতে একটী ক্ষুদ্র টোল আছে। কয়েকটী ছাত্র স্মৃতি পড়ে, স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার। বাড়ীতে মদনমোহন বিগ্রহ আছেন, কিছু জোত জমা আছে, কতকগুলি দুগ্ধবতী গাভীও প্রতিপালিত হয়, শিষ্যবাড়ী হইতেও নির্দ্ধারিত বার্ষিক পান, দিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই যায়, সংসারে কোন অভাব নাই; ব্রাহ্মণ নিজে মদনমোহনের পূজা করেন। বাড়ীর সকলেই পরম বৈষ্ণব ও নিরামিষাহারী, মৎস্য-মাংসের সংস্পর্শ সে বাড়ীতে নাই। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর, এখনও মাতা বর্ত্তমান, সবই সুখ, অভাব কেবল সন্তানের। বৃদ্ধা এজন্য সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধা, পুত্র-দানক্ষমতাপ্রাপ্ত দেবদেবী যেখানে যিনি আছেন, বৃদ্ধা পুত্র-বধূকে লইয়া মানসিক করিতে ছাড়েন নাই। নিকটবর্ত্তী গ্রামে ও দূরবর্ত্তী বিখ্যাত স্থানে যত ষষ্ঠীবৃক্ষ আছে, সব স্থানেই বধূকে দিয়া নুড়ী ঝুলাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তথাপি পুত্রবধূ পুত্রবতী হইলেন না, নানারূপ ক্রিয়া প্রক্রিয়া চলিতে লাগিল। তিন বৎসর পর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের একটী পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করিল।

তাহার নাম রাখা হইল কৃষ্ণকিশোর। কৃষ্ণকিশোরের

আদরের সীমা রহিল না, বৃদ্ধা যেখানে যা মাদুলি পান তখনই তাহা নাতির গলায় পরাইয়া দেন। ক্রমশঃ মাদুলির গুরুত্ব বালকের দেহের গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া পড়িল। দরিদ্রের ধনের মত বক্ষের অন্তরালে অতিযত্নে লালিত হইয়া কৃষ্ণকিশোর পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করিল।

কৃষ্ণকিশোর ঠাকুরমার নয়নের মণি, সদাই যেন চক্ষে হারান। তাঁহার ভয়ে বাড়ীর কাহারও কৃষ্ণকিশোরকে কিছু বলিবার উপায় নাই। সে যাহা জেদ করে, তখনই ঠাকুরমা তাহা পূর্ণ করেন। যে বাটীতে তালতলার চটী ভিন্ন অন্য কোন চর্ম্মপাদুকা প্রবেশ করে নাই, সেখানে নানা প্রকারের জুতা, কৃষ্ণকিশোরের জন্য আসিতে লাগিল। চাদরই যাহাদের একমাত্র গ্রামান্তরে যাইবার অবলম্বন ছিল, এখন কৃষ্ণকিশোরের জন্য কত রকমের হাল ফ্যাসানের জামা সে বাটীতে আসিতে লাগিল। নবকিশোর এ সব লক্ষ্য করিয়াও করিলেন না, পূর্ব্বে যাহা চোকে ঠেকিত, এখন আর ঠেকে না।

কৃষ্ণকিশোর দশ বৎসরে পড়িয়াছে, বালক অতি মেধাবী, এখনই সে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে। একদিন মিত্রজা বলিলেন—"স্মৃতিরত্ন মহাশয়! কৃষ্ণকিশোরকে ইংরাজী শেখান, অমন ছেলেকে ঘরে বসিয়ে রেখে মাটী করবেন না। একটু যত্ন নিলে ও কালে মস্ত লোক হবে।"

পুত্রের প্রশংসায় স্মৃতিরত্ন মহাশয় মনে একটা গর্ব্ব অনুভব করিয়া বলিলেন,—"মিত্রজা বলেছ ঠিক, ও অতি মেধাবী, বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ।"

মিত্রজা। তাই ত বল্‌ছি, ওকে ইংরাজি পড়ান।

স্মৃতিরত্ন। কি জান ভায়া, নানান অসুবিধা। বামুন পণ্ডিতের ছেলে ইংরাজি শেখাতে ভয় হয়, কি জানি মেজাজ কি রকম হয়ে যাবে, আর এ বংশে কখনও কেউ ইংরেজি পড়ে নি, তাই ভয় হয়।

মিত্রজা। ও সব মিছে ভয়, ইংরেজী পড়্‌লেই যে মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়, তার কোন মানে নাই, কত বড় বড় লোক পরম নিষ্ঠাচারী আছেন। আজ কাল কেমন দিনকাল পড়েছে তাত দেখ্‌ছেন, ইংরাজি না জানলে পা বেরুবার জো নাই। টোলো পণ্ডিতের দিন দিন দিন চলা ভার হয়ে উঠ্‌ছে।

মিত্রজা চলিয়া গেলেন। মিত্রজার কথাগুলি স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মনে আন্দোলিত হইতে লাগিল, অনেক চিন্তা করিয়া পুত্রকে ইংরেজী পড়ান কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

কলিকাতায় তাঁহার এক ধনী মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম হরগোপাল চট্টোপাধ্যায়। অবস্থা খুব ভাল, পুত্রকে তাঁহার বাসায় রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইবার মনস্থ করিয়া স্মৃতিরত্ন হরগোপালকে পত্র লিখিলেন; তিনি অতি আহ্লাদের সহিত এই

প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পুত্রকে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় মনের ভাব বাড়ীর কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। একদিন মাতাকে বলিলেন,"এখানে কৃষ্ণকিশোরের ভাল লেখাপড়া হচ্চে না, আজকাল ইংরেজীর চলন হয়েছে, তাই মনে কর্‌ছি, কলকাতায় হরগোপালদের বাড়ীতে রেখে ওকে একটু ইংরেজী পড়াব, সে তা স্বীকার হ'য়েছে।"

বৃদ্ধা অবাক্ হইয়া পুত্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বলিস্ কি নব? দুধের ছেলে, ও বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাবে? আর ইংরেজী ফিংরেজী কেন, ওর বাপ দাদা যা করেছে, ও তাই কর্‌বে।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'মা! দিনকাল যেমন পড়েছে, তাতে সংসার চালান দিন দিন কষ্টকর হচ্ছে। যদি একটু লেখা পড়া শিখে কোন স্কুল কালেজের অধ্যাপক হয়, তা'হলে ওর দিন বেশ সুখে যাবে। সেদিন রামকমল তর্করত্ন বল্‌ছিলো একটু ইংরেজী জানা থাকলে টীকা লিখ্‌লেও ঢের পয়সা পাওয়া যায়, কল্‌কেতায় দুচার জন ইংরেজী জানা পণ্ডিত এই রকম টীকে লিখে ঢের টাকা পাচ্ছে।"

বৃদ্ধা বলিল—"টাকা পয়সা কি জানিস্ সব এই বরাত, সব এই কপালের লিখন"

স্মৃতিরত্ন বলিলেন, "সঙ্গে পুরুষকার চাই।" একটা সংস্কৃত শ্লোকও আওড়াইলেন। মাতাপুত্রে সে দিন আর বিশেষ কোন কথা হইল না।

এই ঘটনার দুইমাস পরে একদিন প্রাতে শুভদিনে শুভক্ষণে বিগ্রহ প্রণাম করিয়া পিতা মাতা ও ঠাকুরমার অশ্রুজলের মধ্যে কৃষ্ণকিশোর পিতার সহিত কলিকাতায় যাইবার জন্য গাড়ীতে গিয়া উঠিল। কৃষ্ণকিশোর ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল, পিতা পুত্রকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

(২)

কৃষ্ণকিশোর এখন হরগোপাল বাবুর বাটীতে থাকিয়া পড়ে, ছুটীর সময় বাড়ী যায়। পড়া শুনায় তাহার যথেষ্ট আগ্রহ, প্রত্যেক বৎসরই পারিতোষিকের সহিত ডবল প্রমোশন পাইতে লাগিল। পিতার আনন্দ ধরে না; তিনি বিগ্রহের চরণে কায়মনে প্রার্থনা করেন পুত্র দীর্ঘজীবী হইয়া বংশ উজ্জ্বল করুক।

হরগোপাল বাবু আধুনিক সমাজের পক্ষপাতী, তিনি হিন্দু ধর্ম্মের অত বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে চান না। তাঁহার এক মাত্র পুত্র সমরেন্দ্র। সমরেন্দ্রের সহিত কৃষ্ণকিশোরের খুব ভাব, উভয়ে এক স্কুলেই পড়ে, টিফিনের সময় তাহার জন্য হালুয়া, লুচি ও দুগ্ধ, বেহারা স্কুলে লইয়া যায়। সেই সঙ্গে কৃষ্ণকিশোরেরও

যায়। প্রথম প্রথম কৃষ্ণকিশোর বেহারার ছোঁয়া স্কুলের নানা জাতি ছেলেদের মধ্যে খাইতে চায় নাই। হরগোপাল শুনিয়া নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন, "গঙ্গাতীরে দোষ নাই।" এদিকে ক্ষুধারও আতিশয্য ; আর স্কুলের ছেলেরা প্রায় সকলেই খায়, তাহার ভিতরেও অনেক ব্রাহ্মণসন্তান আছে। সংসর্গদোষ বড় দোষ। পরিশেষে ক্রমশঃ বালক কৃষ্ণকিশোরের সে সঙ্কোচ দূর হইল।

প্রথমে সে জুতা খুলিয়া খাইত, ক্রমশঃ তাহাও দূর হইল, এখন সে বাজারের হালুয়া কচুরিও খায়। বড় শিখা ছাঁটিয়া নিতান্ত ছোট আকারে পরিণত করিয়াছে। পিতা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে! শিখা ছেটেছিস্ কেন?" কৃষ্ণকিশোর কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—"ছেলেরা সব ঠাট্টা করে টানে।" স্মৃতিরত্ন মহাশয় কিছু বলিলেন না, একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

কৃষ্ণকিশোর বৃত্তির সহিত সর্ব্বপ্রথম হইয়া এণ্ট্রান্স পাশ করিল। পিতার আনন্দের পরিসীমা নাই, তিনি ষোড়শোপচারে মদনমোহনকে ভোগ দিলেন।

সেই বৎসরেই মাতার বিশেষ অনুরোধে স্মৃতিরত্ন মহাশয় একটী পরমাসুন্দরী দশমবর্ষীয়া বালিকার সহিত খুব সমারোহে কৃষ্ণকিশোরের বিবাহ দিলেন। কন্যাটী মাতৃহারা, শ্বাশুড়ী ও

দিদি শ্বাশুড়ী অতি যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া বধূকে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকিশোর বৃত্তির সহিত সর্ব্বপ্রথম হইয়া বি, এ পাশ করিল। ইদানীং তাহার রুচিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; সে আই, সি, এস, পড়িবার জন্য বিলাত যাইতে প্রস্তুত হইল। হরগোপাল যথেষ্ট উৎসাহদাতা এবং আর্থিক সাহায্যও করিতে প্রস্তুত হইলেন। গবরমেণ্টের বৃত্তি লইয়া কৃষ্ণকিশোর বাড়ীর কাহাকেও না বলিয়া একদিন জাহাজে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

(৩)

স্মৃতিরত্ন মহাশয় এ সংবাদে বজ্রাহতের মত হইয়া পড়িলেন। বাড়ীতে একটা ভয়ঙ্কর কান্নাকাটী পড়িয়া গেল, বৃদ্ধা ঠাকুরমা এ আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, প্রবল জ্বরের সঙ্গে বিকার; একদিন ভোরে "কৃষ্ণকিশোর! দাদা! আয়রে" বলিতে বলিতে বৃদ্ধা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণকিশোর বোধ হয় তখন শ্বেতফেন-উচ্ছ্বাসময়ী সাগরতরঙ্গে জাহাজের ডেকে বসিয়া ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল। বৃদ্ধার অন্তিমের এই আকুল আহ্বান সেখানে পৌঁছিয়াছিল কি না জানি না!

পুত্রের এই অচিন্ত্য ব্যবহারে স্মৃতিরত্ন মহাশয় কেমন এক রকম হইয়া গেলেন। সর্ব্বদাই রুক্ষ, কাহারও সহিত ভাল করিয়া

কথা কন না, টোলের ছাত্রেরা এখন তাঁহাকে দেখিলে ভয় পায়। ক্রমশঃ তাহারা বাড়ী গিয়া আর আসিল না। গৃহিণী যদি কখন কৃষ্ণকিশোরের নাম করেন, তীব্রদৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ বলেন, "সে কুলাঙ্গারের নাম করো না, সে আমার পুত্র নয়।" ব্রাহ্মণী ভয়ে কোন কথা বলেন না। পূজার সময়ের মাত্রা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণ বুঝি পুত্রের স্মৃতি এই দেবার্চ্চনায় দূর করিবার চেষ্টায় ছিলেন।

পুত্রবধূ আশা এখন পঞ্চদশ বর্ষের, শ্বশুরের সমস্ত পূজার উদ্যোগ সেই করে। পুত্রের অভাবে স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই পুত্রবধূকেই স্নেহের অবলম্বন করিয়া তুলিলেন। মানুষ একটা কিছু অবলম্বন না লইয়া থাকিতে পারে না, সংসারে প্রেমের আধার চাই, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সকল স্নেহ একমুখী হইয়া পুত্রবধূর উপরে পড়িল।

আশা অতি সুশীলা, শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতামাতার অধিক যত্ন করে, সংসারের গৃহিণী এখন সেই। চতুর্দ্দিকে আদরযত্ন, তথাপি তাহার মনে একটা অপূর্ণতা, নির্জ্জনে যাইলেই চক্ষের জল পড়ে। এ কিসের অভাব? কিসের দৈন্য? পতিপ্রেম-বিহীনা নারীর বুঝি পূর্ণতা হয় না! শ্বশুর শাশুড়ীর আদরের মাত্রা যত বাড়িতে লাগিল, সে ততই মলিন হইয়া পড়িতে লাগিল, এই মনের ভাব আবরণের শত চেষ্টার মধ্যেও মধ্যে

মধ্যে ফুটিয়া উঠে। কৃষ্ণকিশোরের মাতা পুত্রবধূর মানসিক অবস্থা বুঝিলেন, আরও তিনি কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও গৃহিণীর নিকট পুত্রবধূর মনের অবস্থার আভাস পাইয়া একদিন পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! সে জাতিভ্রষ্ট কুলাঙ্গারকে ভুলিয়া যাও, আমরা বুড়াবুড়ী যতদিন আছি, তোমার ততদিন কিসের অভাব, মনে কর তুমি বিধবা।"

আশা শিহরিয়া উঠিল। স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন,"আমাদের মৃত্যুর পর আমার বিষয় আশয় সমস্তই তোমার নামে লিখিয়া পড়িয়া দিব। মদনমোহন রহিলেন, তাঁহারই সেবায় তোমার দিনপাত হইবে, মদনমোহনই তোমার স্বামী, তোমার অন্য স্বামী নাই, তাঁহারই সেবা কায়মনে করিয়া তুমি দিন অতিবাহিত কর। ইহকালের ও পরকালের দুই কাজই হইবে।"

আশা কোন কথা বলিল না, নীরবে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া আশা ভাবিতে লাগিল, আমার স্বামী জাতিভ্রষ্ট, তাঁহার স্পর্শে জাতি যাইবে, তিনিও আমাদের মায়া কাটাইয়া বিলাত গিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমাদের আর সম্পর্ক কি? সম্বন্ধ কি? এই কথাটী মনে হইতেই আশার বুকের ভিতর হু হু করিয়া উঠিল, যেন একটা দারুণ আঘাতে বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর মনে হইল, শ্বশুর বলিয়াছেন "তোমার স্বামী

মদনমোহন"। সে কায়মনে মদনমোহনকে ডাকিতে লাগিল, কই তাহার শূন্যহৃদয় পূর্ণ হইল না, "আমার স্বামী মনে করিতেই আশার স্বামীর মুখখানি মনে পড়ে, সে মুখের তুলনা নাই। মদনমোহনকে আড়াল করিয়া বার বার সেই মুখখানি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার স্বামীর সেই কমনীয় কান্তি, সেই স্নেহ, সেই যত্ন মনে পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইল হিন্দুরমণীর বুঝি স্বামী অপেক্ষা কেহই বড় নাই, হিন্দুরমণীর দেবতা নাই, ধর্ম্ম নাই, পতিই দেবতা, পতিসেবাই ধর্ম্ম, হিন্দুরমণীর স্বামীই মদনমোহন। স্বামীর সুন্দর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে আশা ঘুমাইয়া পড়িল। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

(৪)

সে দিন প্রাতঃকালে বাড়ীর উদ্যানে স্মৃতিরত্ন মহাশয় স্নান করিয়া পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণকিশোর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতা পুত্রের এই অতর্কিত সাক্ষাতে স্মৃতিরত্ন মহাশয় পুত্রের মুখের প্রতি অবাক্ হইয়া দৃষ্টি-পাত করিয়া রহিলেন। রুদ্ধ পিতৃস্নেহে তাঁহার সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিল। বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল,—পরক্ষণেই পুত্রের পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি পড়িল ;—হ্যাট কোট পরা ফিরিঙ্গী মূর্ত্তি! ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন, পুত্রকে কোন কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন না। পিতার এই ব্যবহারে অভিমানহত

কৃষ্ণকিশোরও কোন কথা বলিল না। বরাবর বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। কৃষ্ণকিশোর সুখ্যাতির সহিত বিলাতে সিবিল সার্ভিস পাশ করিয়া এখানে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটসিপ্ লাভ করিয়াছে।

ভিতরের উঠানে কৃষ্ণকিশোরের মাতা রৌদ্রে কি শুকাইতে দিতেছিলেন। পুত্রবধূ দাওয়ায় বসিয়া কুটনা কুটিতেছিল, হঠাৎ একটা সাহেবকে বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে দেখিয়া কৃষ্ণকিশোরের মাতা অস্ফুট চীৎকার করিয়াই সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আশা কুটনা ফেলিয়া দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আশা তাহার স্বামীকে চিনিতে পারিয়াছিল। কম্পিতকণ্ঠে কৃষ্ণকিশোর ডাকিল, "মা!" এই অপ্রত্যাশিত অতিরিক্ত আনন্দ আবেগে মাতা পড়িয়া যাইতেছিলেন। কৃষ্ণকিশোর অগ্রসর হইয়া হস্ত ধরিতে গেল, তিনি স্পর্শভয়ে সরিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় পিতা উঠানে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "ওকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বল, এ ঠাকুরদেবতার বাড়ী, ম্লেচ্ছের স্থান নাই।"

কৃষ্ণকিশোর জীবনে কখনও এরূপ অনাদর উপেক্ষা লাভ করে নাই। বিশেষ স্নেহময় পিতার এই কঠোর ব্যবহারে সে হৃদয়ে বড়ই আঘাত অনুভব করিল। অভিমানে ক্রোধে তাহার চক্ষু ফাটিয়া

জল আসিতেছিল। আজ দুই বৎসর প্রবাসের পর কত আশা লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছে, সে অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "উত্তম, আমি বিদায় হইতেছি, আমি আমার বিবাহিতা পত্নীকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইতে চাই।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন,—"তোমার পত্নী নাই, গোখাদক ম্লেচ্ছের হিন্দুরমণীর সহিত সম্বন্ধ কি ?"

কৃষ্ণকিশোর বলিল, "আপনার না থাকিতে পারে, আমার পত্নীর অবশ্য আছে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে যদি আমার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চায়, এখনি আমার সহিত চলিয়া আসুক।"

আশা দরজা খুলিয়া ঘোমটা দিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত হইয়া শ্বশুর পুত্রবধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বউ মা ! তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের কন্যা, ও ম্লেচ্ছের সহিত কোথায় যাবে, তোমার স্বামী নাই, মদনমোহনই তোমার স্বামী।"

কৃষ্ণকিশোর বলিল, "তোমার ইচ্ছা হইলে আমার সহিত আসিতে পার, নতুবা ভবিষ্যতে আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।" কৃষ্ণকিশোর বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝড়ের মত পুত্রবধূ ছুটিয়া গিয়া স্বামীর জামা সজোরে চাপিয়া ধরিল। কৃষ্ণকিশোর পত্নীর হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। স্তম্ভিত হতবুদ্ধি স্মৃতিরত্ন মহাশয় অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন !

ভাই

একত্রিংশ-বর্ষীয়া রমণী ধূমপান-নিরত প্রৌঢ় স্বামীকে নথ নাড়িয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল,—"তোমার কেমন সবই উল্টো, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নেই কোথা? তুমি যেমন বোকা, তাই আখেরের কথা একবারও ভাব না, কত ভদ্রলোকের ঘরে হচ্ছে, আমরা ত ছোট লোক।"

"তাই ত ছোট লোকের মত ভাইয়ে ভাইয়ে এক জায়গায় আছি," বলিয়া স্বামী বেচারী তামাকের কল্কেটী নীরবে দাওয়ায় বসিয়া পোড়াইতে লাগিল।

পত্নীর কিন্তু উপদেশ বর্ষণের বিরাম নাই; কখনও উগ্র, কখনও মিষ্ট, কখনও আদর, কখনও তিরস্কার, নানা ভাব মিশ্রণে নানারূপ সুরভঙ্গিতে বর্ষার বারিধারার মত উপদেশরাশি বর্ষণ হইতে লাগিল।

এই প্রবল বন্যার তোড়ের মুখ হইতে কোনরূপে আত্ম-রক্ষার মানসে হাই তুলিয়া, প্রৌঢ় বলিল—"বড় ঘুম পাচ্ছে শুইগে।"

বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল, তথাপি পত্নীর বাক্যের বিরাম নাই, মধ্যে মধ্যে ওগো শুন্‌ছো বলিয়া গা ঠেলিতে লাগিল। উঁ

আঁা করিয়া কোনরূপে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে: বেচারি কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল।

নটবর দাস জাতিতে মাহিষ্য, জমিদারী সরকারে তহশীল-দারী করিত। মনোহর তাহার ভাই, লেখাপড়া শিখে নাই অর্থাৎ তহশীলদারী করিতে যতটুকু বিদ্যার দরকার, তাহাও তাহার নাই, দুই ভাই এক অন্নেই আছে।

মাহিনা সামান্য, কিন্তু সম্মান বড়। সকলেই জমিদারের তহশীলদার বলিয়া নটবরকে খাতির করে, কিছু ক্ষেত খামারও আছে, মনোহর তাহার দেখা শুনা করে। সে সেই সকাল বেলা মাঠে যায়, চাষাদের সঙ্গে নিজেও খাটে, বিশেষ সে খুব পরিশ্রমী, কাজেই গড়পড়তায় তাহার জমী প্রায় প্রতি বছরেই ফলে। নটবরের সামান্য মাহিনার আয়ে ও মনোহরের অক্লান্ত পরিশ্রাম-জাত চাষের শস্যের সাহায্যে সংসার এক রকম বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই চলে, বরং বছরে কিছু উদ্বৃত্ত হয়।

মনোহর পাটের সময় পাট বাঁধিয়া রাখে, ধান সস্তা দেখিলে তাহাও খরিদ করে, মহার্ঘ্যের বাজারে তাহা বেচিয়া বেশ দু পয়সা হয়। ভ্রাতৃবধূ এই সমস্ত দেখিয়া জ্বলিয়া উঠে। তাহার ধারণা এ সকলই তাহার স্বামীর রোজগারে। আর কোথাকার কে তাহার স্বামীর সহোদর তাহার কাচ্চা বাচ্ছা লইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খায়, ইহা ক্ষুদ্রচেতা রমণীর

অসহ্য হইয়া উঠিল, আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতু ধূম-মিশ্রিত অগ্নির মত তাহা মধ্যে মধ্যেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

. নটবরের সন্তানাদি নাই, মনোহরের তিনটি পুত্র, দুইটি কন্যা, স্ত্রীটী নিতান্ত গোবেচারী, ভাত চড়ে রা ফোটে না। নতুবা এই কলহের মাত্রা এত প্রবল হইয়া পড়িত যে, এতদিন দুই ভাই এক সংসারে থাকিতে পারিত না। যাহা হউক, একরকমে দিন কাটিতে ছিল।

নটবর ভ্রাতাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিত, বুঝি অত ভাল জগতে কাহাকেও বাসিত না। তাহার অশিক্ষিত হৃদয়টি ভ্রাতৃপ্রেমে পূর্ণ ছিল।

বড় বধূর ইহা অসহ্য। ভ্রাতুষ্পুত্রগুলিকে নটবর অতিশয় স্নেহ করিত, পত্নী ভাবিত একি আপদ্। যদি ইহারা এই সুখ-সম্পদ ছোটবড় সকলে মিলিয়া ভাগ বাটরা করিয়া লয়, তবে আর তাহার থাকে কি! বড় বধূর উপদেশের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল।

(২)

সে দিন বৈকালে নটবর হাট হইতে বড় বড় ফজলি আম কিনিয়া আনিয়াছিল। নটবর বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই "কি এনেছ জ্যাঠা মশায়, কি এনেছ জ্যাঠা মশায়" বলিতে বলিতে মনো-

ঘরের ছেলে মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল! নটবর একটা ভারি আমোদ বোধ করিতে লাগিল। তাহার শ্বেত দন্তগুলি অর্দ্ধপক্ক শ্মশ্রুর অন্তরাল হইতে ঈষৎ মুখ বাহির করিয়া এই হাসিতে যোগ দিল, নটবর বলিল—"দাঁড়া বঁটি আন।" তিন চারিজনে ছুটিয়া একখানি বঁটি আনিয়া হাজির করিল। নটবর তখনই দাওয়ায় বসিয়া আম ছাড়াইয়া বালকবালিকাগুলিকে দিতে লাগিল। আর একটি আমও নিজেদের জন্য রহিল না। বড় বধূর এ দৃশ্য অসহ্য হইয়া উঠিল।

এই নির্ব্বোধ স্বামীটির বৃদ্ধ বয়সেও বুদ্ধি হইল না, এইজন্য আক্ষেপের মাত্রা এত অতিরিক্ত হইল যে, সমস্ত রাত্রি স্বামী বেচারি ত্রাহি ত্রাহি করিয়া প্রভাতেই নটবর মনোহরকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই তুমি আলাদা হও।"

ভ্রাতার মুখে এরূপ কথা কখনও বাহির হইবে মনোহর কল্পনায় আনিতে পারে নাই; সে অবাক্ হইয়া ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নটবর বলিল—"যাহা আছে ভাগ বাটওয়ারা করিয়া লও, পাড়ায় মোড়লদের ডাকিয়া আন।"

মনোহর মাথায় হাত দিয়া দাওয়ায় বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া ভালমন্দ কিছুই বাহির হইল না। ভ্রাতাকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া নটবর নিজেই মোড়লদের ডাকিতে গেল।

ছোট বধূ জল লইয়া আসিয়া স্বামীকে ওরূপভাবে দাওয়ায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ গা সকাল বেলায় অমন ক'রে গালে হাত দিয়া ব'সে কেন?"

মনোহর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"দাদা আমাদের আলাদা ক'রে দিয়েছে।"

ছোট বধূ বিস্মিত হইয়া বলিল—"বল কি?" মনোহর বলিল,—"হাঁ দাদা মোড়লদের ডাকতে গেছে।"

ছোট বধূ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তা আর ভেবে কি হবে। এস, অদৃষ্টে যা আছে হবে।"

মনোহর উদাসভাবে বলিল,—"তাই ত ভাবছি, আমার দাদা ত তেমন নয়।"

জোত জমি ভাগ বাটওয়ারা হইয়া গিয়াছে। বড় বধূ অনেকটা নিশ্চিন্ত, কিন্তু সংসারের কাজ কর্ম্মে সে তত পরিপক্ক ছিল না, বড় ঢিলে মেজাজের লোক। রান্না হয় ত, উঠান ঝাঁট পড়ে না, উঠান ঝাঁট পড়ে ত রান্না হয় না; সে সংসার লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল।

সে বৎসর নটবরের জমি ভাগে দেওয়া হইয়াছিল। ফসল অতি অল্পই ঘরে আসিল, তাহাতে তিন মাসের বেশী সংসার চলে না।

মনোহর পৈতৃক জমি চাষ করিয়াছিল, উপরন্ত ভাগেও

কতকগুলি জমি লইয়া চাষ করিল। চাষ-লভ্য ধান্যে এক-বৎসরের খোরাক হইয়াও প্রায় দুই শত টাকার ধান অতিরিক্ত হইল। ধানের বাজারের বাড়তির মুখে ধান্যগুলি বিক্রয় করিয়া প্রায় তিনশত টাকা পাইল।

(৩)

পৃথক্ হইবার কিছুদিন পরেই নটবর তহশীলদারী ছাড়িয়া-দিয়াছিল। ঘরে আহার নাই, সে নড়িয়া বসিতে চায় না। সংসারের কোন অভাবের কথা বড় বউ বলিতে আসিলেই বলে, "আমি কি জানি। সুখে থাকবে ব'লে সংসার আলাদা ক'রে নিয়েছ, যেমন করে পার চালাও"।

বড় বউ যদি বলে, চাকরী কর। নটবর বলে, "চাকরী কি মুখের কথা? চাকরী কি রাস্তায় পড়ে আছে। কত লেখা পড়া শিখে ভদ্রলোকের চাকরী হয় না, আমায় চাকরী দেবে কে?" বড় বউ বলে, তুমি ত চাকরী কর্‌তে, ছাড়্‌লে কেন? নটবর বলে, আমি কি ইচ্ছা ক'রে ছেড়েছি? মনিব রাখলে না তো ক'রবো কি! বড় বধূ বলে এতদিন রাখ্‌লে কেন! নটবর ভ্রাতাদের লক্ষ্য করিয়া বলে সে ওদের বরাতে, এখন ত আর ওদের বরাত নাই, এখন তোমার বরাত। যেমন

ক'রে এসেছ তেম্‌নি পাবে। বড় বধূ তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠে।

সে বৎসর চৈত্রমাসে ভাল বৃষ্টি হইল না, লাঙ্গল দিবার জো পাওয়া যায় না। যে দুই একদিন দু এক ফোঁটা হইয়াছিল তাহাতেই বিশেষ উদ্যোগ করিয়া মনোহর লাঙ্গল দিয়া জমির পাট করিল। নটবরের ভাগের জমি দেখে কে, তাহার নিজেরও দৃষ্টি নাই, প্রায় সমস্ত জমি পতিত রহিয়া গেল। আবার ভাদ্র মাসে দারুণ বর্ষা, নদীতে বন্যা আসিল। তাড়াতাড়ি মনোহর অনেক চেষ্টায় প্রায় বার আনা শস্য ঘরে তুলিল। নটবরের দু' একখানা জমি যাহা হইয়াছিল তাহাও বন্যায় নষ্ট হইয়া গেল।

নটবরের সংসারে পূর্ব্ব হইতেই শস্যের অভাব ছিল। তাহাতে এই দৈববিপাকে সংসার চলা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িল।

লোকের নিকট ঋণ করিয়া করিয়া নটবরকে আর কেহই ঋণ দিতে চায় না। সে টাকা লয়, কিন্তু শোধ করিবার নামটি করে না।

শুষ্ক মুখে বড় বধূ আসিয়া বলিল—"আজ আর ঘরে এক মুঠাও চাউল নাই।"

নটবর গম্ভীর ভাবে বলিল—"তা আমি কি ক'রবো। ঘটী বাটী বাঁধা দিয়ে আন।"

বড় বধূ বলিল—"তাও কি ছাই আছে ? এই ত বছর ধরে নাই নাই, আর কি করে চলে ? জল খাবার ঘটীটা অবধি নেই।"

নটবর। নেই ত খেও না।

বরবধূ। আমি যেন নেই খেলুম, তুমি কি খাবে ?

নটবর। কেন! আমার আবার ভাবনা কি ? তোমার ভাবনা তুমি ভাব। আমার ভাই আছে. ভাই-বউ আছে, তাদের এক মুটো হলে আমাকেও আধ মুটো দেবে।

বড় বধূ গর্জ্জিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "যদি এমন ভাই তবে আলাদা হ'লে কেন!"

নটবর বলিল, "তোমার জ্বালায়।"

বড়বধূ। বটে, আমার জ্বালায়! আমি তোমার বড় অহিতকারী, না ?

"সেটা মনে মনে বুঝে দেখ" বলিয়া নটবর ছোট ভাইএর উঠানে গিয়া ডাকিল, "মনো বাড়ী আছিস্"

শশব্যস্তে মনোহর বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি দাদা"। নটবর বলিল ছোট বউমাকে বল্ আমি আজ এখানে খাব।

বিস্মিতভাবে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া মনোহর ভিতরে চলিয়া গেল।

(৪)

এখন মধ্যে মধ্যেই নটবর মনোহরের বাড়ীতে খায়। বড় বধূকে প্রায়ই উপবাসী থাকিতে হয়। ছোট বধূ এ সংবাদ জানিতে পারিয়া একদিন আসিয়া বলিল,—"দিদি, তোমার ঠাকুর পো বল্‌লেন্, আজ আমাদের ওখানে তোমার নেমন্তন্ন।"

বড় বধূর তখনও অভিমান যায় নাই। এ অভ্যর্থনা তাহার বিদ্রূপ বলিয়া মনে হইল। সে তাচ্ছিল্যভাবে বলিল, "আমার অসুখ"।

অনাহারে দুশ্চিন্তায় সত্যই বড়বধূ পীড়িত হইয়া পড়িল। ছোটবধূ আপ্রাণ চেষ্টায় বড় বধূর সেবা করিতে লাগিল। ছোট বধূর এই আত্মীয়তার মধ্যেও বড়বধূ প্রথম প্রথম অহঙ্কার ও উপেক্ষা অনুভব করিতে লাগিল। ছোটবধূ কাছে আসিলেই কোন না কোন অছিলায় তাহাকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু ছোটবধূ যায় না। সে নিঃস্বার্থভাবে বড় বধূর সেবা করে, বুঝি মায়ের পেটের বোনও এত করে না।

ছোট বধূর এই সরল ব্যবহারে ক্রমশঃই বড়বধূ কোমল হইয়া পড়িতে লাগিল, নিজের ত্রুটি সে বেশ মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল। পরশপাথর স্পর্শে লৌহও সুবর্ণ হয়। বড়বধূ অনুতাপে এক দিন ছোট বধূর হাত দুটি ধরিয়া বলিল—"ছোট বউ, তুই আমায় মাপ কর, আমি তোকে চিনিনি।"

বড় বধূর অশ্রুজলে ছোট বধূর সুকোমল হস্ত দুখানি প্লাবিত করিয়া দিল। ছোট বধূ আর্দ্রকণ্ঠে বলিল—"কিছু নয় দিদি, আমি তোমার ছোট বোন।"

ভাদ্র মাস। একে জল শুকাইয়া আসিতেছিল, তাহাতে পাটপচার গন্ধে গ্রাম ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব, দুই একটি পুষ্করিণী যাহা আছে তাহারও শৈবাল পচিয়া ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ও জল গাঢ় রক্তবর্ণ হইয়া পড়িল। একদিন সন্ধ্যার সময় শয্যায় শুইয়া নটবর গায়ে কাঁথা চাপা দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"বড় বউ, আমার বড় জ্বর এল, এক বার মনোকে ডাক।"

মনোহর ছুটিয়া আসিল। নটবর বলিল, "মনো! "আমাকে খুব করে চেপে ধর। আমার হাড়ের ভিতর অবধি কন্ কন্ কচ্ছে।"

মনোহর আহার নিদ্রা ভুলিয়া দাদার সেবা করিতে লাগিল। সে বাহিরের সব ভুলিয়া গিয়া দাদার রুগ্নশয্যাটী অধিকার করিয়া বসিল।

(৫)

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, নটবরের জ্বর ত্যাগ হইল না। মনোহরও সে মনোহর নাই। দারুণ উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় তাহার

স্বাস্থ্যপ্রতিফলিত চক্ষু দুইটি ম্লান ও কোটরগত হইয়া গিয়াছে। মুখ শুষ্ক বিবর্ণ, যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। একদিন প্রাতে ভ্রাতার হাত দুটি ধরিয়া নটবর ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—"ভাই, আমি আর বাঁচবো না।"

মনোহর কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয্যা ভিজাইতে লাগিল। ক্ষীণ হস্তে সাদরে ভ্রাতার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিয়া নটবর বলিল—"ছি! ভাই কেঁদনা ভয় কি! ভগবান্ আছেন, আমার একটি শেষ সাধপূর্ণ কর।"

উৎকণ্ঠিতভাবে আদেশের প্রতীক্ষায় মনোহর ভ্রাতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। নটবর বলিল—"বড় বউকে শিক্ষা দিবার জন্য আমি তোমাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি মনে প্রাণে তোমার সেই দাদাই আছি।"

উদ্বেলিত কণ্ঠে মনোহর বলিল,—"দাদা, তা আমি জানি। তুমি যদি আমার পর হও, তবে সংসারে আমার আপনার কে?"

নটবর বলিল—"আমি ইচ্ছে ক'রে চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।" সংসারের প্রতি দৃষ্টি করি নাই, এ অভাব আমি ইচ্ছা করে ডেকে এনেছি। অভাব না হলে মানুষের শিক্ষা হয় না। বোধ হয়, বড় বউ আর ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে আপনাকে ভুলে যাবে না। আজ আমার শেষ ইচ্ছা, আবার আমরা দুভাই বাহিরেও এক হই।

তুমি বড় বউকে বল, ছোট বউকে সঙ্গে করে এক হেঁসেলে রান্না চড়াক। তারপর সেই আগের মত এক জায়গায় দুজনকে খেতে দিক্। আবার আমরা সেই পূর্ব্বের মত দুভাই এক সঙ্গে ব'সে খাই।

মনোহর। দাদা, আমি সব জানি। তুমি ভাল হও, আমরা এক মার পেটের দু ভাই, যম না হলে আমাদের কেউ আলদা কর্‌তে পার্‌বে না।

নটবর। না ভাই, মানুষের মরা বাঁচার কথা বলা যায় না। হয় ত এ সাধ আমার জীবনে নাও মিট্‌তে পারে। তুমি বাধা দিও না, অন্ন প্রস্তুত কর্‌তে বল।

মনোহর আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না, সে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিয়া আসিল।

সেই ঘরেই দুখানি আহারের স্থান করা হইল। নটবর বলিল—"ভাই আমায় ধরে তুলে খাবার জায়গায় বসিয়ে দাও।" মনোহর ও বড় বউ দুই জনে ধরাধরি করিয়া নটবরকে আহারের স্থানে বসাইয়া বড় বউ ধরিয়া রহিল। নটবর বলিল—"ভাই তুমি খেতে বস।"

মনোহর আহারস্থানে গিয়া বসিল। তাহার পর দুই ভাই আহার করিতে লাগিল।

যে নটবর দারুণ অরুচিতে কিছুই আহার করিতে

পারিত না, সে আজ পরম তৃপ্তিতে পূর্ণ রুচির সহিত আহার করিল।

জ্বরের উপর পেটে ভাত পড়ায় রাত্রে জ্বর প্রবল আকারে বাড়িয়া বিকারে পরিণত হইল। মনোহর ছুটিয়া কবিরাজ লইয়া আসিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। রাত্রি বারটার পর হইতে নটবর প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত রাত্রি মনোহর এক বারও ভ্রাতার শয্যা ত্যাগ করিল না।

ভোর বেলা নটবর ঘরের চারিদিকে বড় বড় চোক করিয়া চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, "ভাই!" মনোহর ব্যস্ত হইয়া দাদার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নটবর ধীরে ধীরে ভ্রাতার হাত দুই খানি বক্ষের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া স্থির দৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। আর পলক পড়িল না, বাহিরে ভোরের কাক কর্কশ স্বরে কলরব করিয়া উঠিল। মনোহর দাদার বুকের উপর আছাড়িয়া পড়িয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিল, "দাদা!"

বুঝি ভ্রাতার সে আকুল আহ্বান, দাদার আত্মার সহিত পরলোকেও ধাবিত হইল।

———

পোষ্য-দান

শুষ্ক কণ্ঠে উমাকালী বলিল, "আজ চাল বাড়ন্ত।" ম্লান দৃষ্টিতে রাধানাথ পত্নীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। উমাকালী বলিল,—"আমাদের যা হবার হবে, দুধের ছেলের আর দুঃখ দেখ্‌তে পারিনি। খোকার খাবার এক ফোঁটাও দুধ নেই।" সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রাধানাথ বলিলেন,—"হুঁ—দেখি।" রাধানাথ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রাধানাথ জমিদারী সেরেস্তায় সামান্য কর্ম্ম করিতেন, আজ দুই বৎসর হইল কর্ম্মটী গিয়াছে। যখন কর্ম্মটী যায়, তখন কন্যা শ্যামাসুন্দরী চতুর্দ্দশ বৎসরের, আর রাখা যায় না, বৃদ্ধ রাধানাথ চতুর্দ্দিক্‌ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পত্নীর সামান্য কয়েকখানি অলঙ্কার ও পৈতৃক জোতজমা বিক্রয় করিয়া কোনরূপে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইলেন। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই শ্বশুরগৃহ-নির্ব্বাসিতা বিধবা কন্যা পিতার পর্ণ-কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

দুঃখের উপর দুঃখ। সেই বৎসরেই বড় পুত্রটি ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করিল। হাতে অর্থ নাই, চিকিৎসা হইল না, একরূপ অচিকিৎসাতেই পুত্রটি মারা গেল। পিতা

মাতা শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাহার উপর দারুণ অন্নকষ্ট! রাধানাথ কত স্থানে ঘুরিলেন, কর্ম্ম জুটিল না। ক্রমশঃ ভিখারীর মত দুই এক টাকা সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। তাহাতে সংসারের কি হইবে। দুইটী পুত্র, তিনটী কন্যা, নিজে, স্ত্রী। অনশনে দুশ্চিন্তায় বৃদ্ধ ক্রমশঃই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রকৃতিও কঠোর হইয়া পড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে পুত্রকন্যার অনশনে যতটা কাতর হইয়া পড়িতেন, এখন আর তেমন হন না। আঘাতে আঘাতে চিত্তের কোমলবৃত্তি কর্কশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

ছোট পুত্রটির ছয়মাস হইল জন্ম হইয়াছে, সময়ে এক ফোঁটা দুধ পায় না, মাতৃস্তনেও দুধ নাই, শীর্ণ স্তনের শুষ্কমুখে বক্ষোরক্ত সঞ্চার করিয়া, অনশনকাতরা স্নেহময়ী জননী সন্তানকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শিশুর শুষ্কমুখ দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়, জননীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। শীর্ণ সন্তানকে প্রবল আবেগে পঞ্জরদৃষ্ট বক্ষে চাপিয়া ধরেন, বুকে একটা শান্তি আসে, প্রবল আগ্রহে বার বার পুত্রের মুখ চুম্বন করেন।

রাধানাথ চাকুরীর জন্য নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যখন ধনিগৃহে নানাবিধ ব্যঞ্জনপূর্ণ অন্নের থালাটী তাঁহার সম্মুখে আসিত, তখন দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। সম্মুখের

অন্ন দেখিতে পাইতেন না। রাধানাথের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত—অনশনকাতরা সাধ্বী, ক্ষুধিত সন্তানকে শীর্ণ বক্ষে লইয়া জীর্ণ কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে; ক্ষুধায় ব্যাকুল হতভাগ্য সন্তানেরা জননীর ছিন্ন অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতেছে কেহ বা মাটীতে পড়িয়া ধুলায় লুটাইতেছে, তাঁহার মুখে অন্ন উঠিত না। পার্শ্ববর্ত্তী যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, ঠাকুর মহাশয়, খেলেন না? রুদ্ধকণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলেন,—"না, ক্ষিদে নেই।" গভীর সহানুভূতিতে প্রশ্নকারীর অন্তর প্লাবিত হইয়া যায়।

এত কষ্টেও রাধানাথের চাকুরী জুটিল না। এখন বাড়ীতে খুব কম সময়ই থাকেন, একটা না একটা অছিলায় বাহির হইয়া যান, দুই তিন মাস আসেন না, বাড়ীতেও কোন সংবাদ দেন না, এমনি ভাবে দিন কাটিতেছিল।

ইদানী বাড়ী আসিলে স্নেহময়ী রমণী সংসারের বিশেষ কোন অভাব অভিযোগ স্বামীর নিকট কহিতেন না। কত দিন নিজে অনশনে থাকিতেন, কিন্তু স্বামীকে তাহা জানিতে দিতেন না! স্বামীর অন্তরের দুঃখ পতিপ্রাণা খুব ভাল ভাবেই জানিত। সেদিন চাল নাই শুনিয়া "হুঁ দেখ্‌ছি" বলিয়া যখন রাধানাথ চলিয়া যান, তখনই উমাকালী বুঝিতে পারিয়াছিল, স্বামী আবার কিছু দিনের জন্য গৃহত্যাগ করিলেন। স্বামীর সেই ম্লান দৃষ্টি—আভিতে উমাকালীর সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিতেছিল।

(২)

ঘর্ম্মাক্ত ললাট মুছিয়া পুরাতন ছাতাটির উপর ভর দিয়া, রাধানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেওয়ানজী মহাশয়, শুন্‌চি গিন্নি মা নাকি পুষ্যি নিবেন।"

দেওয়ানজী বলিলেন—"না নিয়ে আর উপায় কি? এত বড় বংশটা লোপ হয়। কিন্তু নেবার মত ছেলে পাইনি। আপনার সন্ধানে ভাল বংশের ছেলে আছে কি?"

রাধানাথ ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"আছে।"

দেওয়ানজী উৎসাহে বলিলেন—"কার সন্তান?"

রাধানাথের নিজের সন্তান আছে বলিতে কেমন একটা সঙ্কোচ ও দুঃখ আসিল। তিনি বলিলেন—"যদি প্রয়োজন হয় আমাদের গ্রামের তিনকড়ি মুখুয্যের ছেলে আছে, তত্ত্ব করিয়া দেখিতে পারেন।" দেওয়ানজী বলিলেন—"উত্তম, আমরা কল্যই সেখানে যাইব।" ব্রাহ্মণ বিদায় হইলেন।

দেওয়ানজী মহাশয় থাকিতে অনেক অনুরোধ করিলেন, ব্রাহ্মণ কিছুতেই থাকিলেন না, সেই মধ্যাহ্নে অনশনে রাধানাথ গ্রামের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন, কোথায় যাইবেন স্থির নাই। উদ্বেলিত চিত্ত ব্রাহ্মণ নদীর ধারের একটা বড় বটগাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল,

অঞ্জলি ভরিয়া নদীর জল আকণ্ঠ পান করিয়া, সেই বৃক্ষের শীতল ছায়ায় মাটিতেই শুইয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণের যৌবনের কথা মনে পড়িতে লাগিল, সেই বিবাহ, কত উৎসাহ, কত আশা, একটী সন্তানের জন্য স্ত্রী পুরুষের কত ব্যাকুল প্রার্থনা, খোকার জন্ম, কন্যার বিবাহ, সেই শীর্ণ ছোট পুত্রটীর মুখ—সেই পুত্র আজ কেমন করিয়া পরের হাতে সঁপিয়া দিবেন, ব্রাহ্মণ চিন্তায় আত্ম-হারা হইলেন। উদ্‌ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ লাফাইয়া উঠিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল "ভগবান্ মৃত্যুর আর কত বাকি!" অবসাদে ব্রাহ্মণ আবার মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন, ভাবিলেন, "উপায় কি! তবু খেয়ে বাঁচবে—হাঁ পোষ্য পুত্র দিব।" নদী কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনি হইল "হাঁ। পোষ্য পুত্র দিব।" ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিতে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কই বড় পুত্রটীকে যমের হাতে তুলিয়া দিয়াও তো এত দুঃখ হয় নাই। ব্রাহ্মণ নদীর ধারে পায়চারি করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বেলা গেল, সন্ধ্যা হইল, রাত্রের অন্ধকারেও ব্রাহ্মণ অনশনে নদীর ধারে ঘুরিতে লাগিলেন।

(৩)

প্রভাতে রৌদ্র দাওয়ায় আসিয়া পড়িয়াছে। খোকার বড় সর্দ্দি, সন্তান বিছানায় শুইতে চায় না, উমাকালীর কোলে করিয়া সন্তানকে দুলাইতেছিলেন। উঠানে কয়েকটা ভেঁট ও তাহার ডাঁটা লইয়া পরম আহ্লাদে আগ্রহে ক্ষুধার্ত্ত সন্তানেরা খাইতেছিল। উমাকালীর চক্ষে জল আসিল, ভাবিল, "আহা! দুধের বাছা, কোন পাপে এদের এ দুর্দ্দশা, এক মুঠো শুধু ভাত নুন দিয়ে জোটে না।"

খোকা কাঁদিয়া উঠিল, উমাকালী স্তন মুখে দিলেন, সে শুষ্ক স্তনে দুধ ছিল না। খোকা টানিয়া টানিয়া হাঁপাইয়া উঠিল, আরও জোরে কাঁদিতে লাগিল। সর্দ্দিতে তাহার নাক মুখ বুজিয়া গিয়াছিল; স্তনশোষণের শক্তি ছিল না।

উমাকালী উঠিয়া একটু শরিষার তৈল আনিয়া খোকার হাতে পায়ে মালিস করিয়া দিতে লাগিল। উমাকালী শুনিয়াছিল, মাটীর শুষ্ক দেওয়ালে, শিশুর পায়ে তৈল মাখাইয়া চাপিয়া ধরিলে, বিশেষ উপকার হয়। উমাকালী খোকার পা রৌদ্রতপ্ত দেওয়ালে চাপিয়া চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ক্ষুদ্র পায়ের দাগ দেওয়ালের গায়ে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সেই ক্ষুদ্র পদের তৈলাক্ত চিহ্নগুলি কি সুন্দর,

করুণাময়ী জননী মুহূর্তে সব ভুলিয়া পদচিহ্নগুলির প্রতি অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিল।

ঠিক সেই সময়েই বিশুষ্ক মুখে রাধানাথ উঠানে প্রবেশ করিলেন। তিনিও স্তম্ভিত হইয়া স্নেহময়ী জননীর এই স্বর্গীয় দৃশ্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। এক টুকরা ভেঁটের ডাটার জন্য, তাঁহার একটি শিশু কন্যা মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে, তদপেক্ষা বড় সন্তানটী তাহা কিছুতেই দিবে না, সে পিতাকে সে দিকে চাহিতে দেখিয়াই ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বাবা! দেখতো বিন্দু সব খেতে চায়, আমিও তো কাল কিছু খাইনি, ওকে দিলুম, তবু ও সব খাবে।" রাধানাথের চক্ষে জল আসিল, কোন কথা না বলিয়া দ্রুত বাহিরে গেলেন।

উমাকালী এতক্ষণ স্বামীর আগমন জানিতে পারে নাই। পুত্রের ক্রন্দনে চাহিয়া দেখিল, স্বামী উঠানে দাঁড়াইয়া পরক্ষণেই সন্তানের অভিযোগে দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। উমাকালীর কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না, স্বামীর বিশুষ্ক মুখখানি মনে পড়িল,—"ওগো শোনো গো শোন", বলিতে বলিতে সন্তান ফেলিয়া স্বামীর পশ্চাতে ছুটিল। সন্তান কাঁদিয়া উঠিল, রাধানাথও বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণ ছুটিয়া নদীতীরে চলিলেন। পথেই দেওয়ানজীর

সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহারা পোষ্যের সন্ধান করিতে আসিয়াছেন। রাধানাথকে দেখিয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "আপনি ত খুব লোক? তিনকড়ি মুখুয্যের একটী মাত্র সন্তান। আমরা কথা পাড়িতেই ব্রাহ্মণ আমাদের মারে আর কি, কোনরূপে তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মহাশয়ের অনুসন্ধান করিতেছি, এখন উপায় কি? শুনিয়াছি আপনার দুইটী সন্তান, একটী আমাদের দিন্ না? এই তিন লক্ষ টাকার ষ্টেটের মালিক হ'বে, আপনারও দুঃখদৈন্য দূর হইবে।"

ব্রাহ্মণ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন,—"বেশ, তাই দিব।"

দেওয়ানজীকে সঙ্গে লইয়া রাধানাথ বাড়ী আসিলেন। বাড়ীর সন্নিকটে একটী বটবৃক্ষের ছায়ায় দেওয়ানজীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। ব্রাহ্মণী তখন রান্নাঘরে ছিলেন।

শিশু পুত্রটী দাওয়ায় শুইয়া আছে, অন্যান্য সন্তানেরা কোথায় গিয়াছে, ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ চোরের মত নিজের সন্তান নিজে ক্রোড়ে উঠাইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন।

দেওয়ানজী ছেলে দেখিলেন, আহা! শিশুর কি রূপ! গলিত স্বর্ণের মত ঢল ঢল করিতেছিল, সুকৃষ্ণ কেশ, চম্পক-কলির মত অঙ্গুলি, ওষ্ঠ, পদ ও হস্ত দুই খানি বন্ধুলি পুষ্পের মত

লাল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলের এত রূপ! দেওয়ানজী অবাক্ হইলেন। নিদ্রিত শিশু পিতার কোলে চুপ করিয়াছিল। দেওয়ানজী বলিলেন,—"তা হলে কলাই আমরা ছেলে লইয়া যাইব।" ব্রাহ্মণ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"বেশ তাই লইয়া যাইবেন।" দেওয়ানজীরা চলিয়া গেলেন।

সন্তান ক্রোড়ে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই উমাকালী জিজ্ঞাসা করিল,—"অসুখ ছেলে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে!" "কোথাও না" বলিয়া ব্রাহ্মণ স্ত্রীর কোলে সন্তান দিলেন! স্বামীর মুখ দেখিয়া একটা অজানিত গুরুতর আশঙ্কায় উমাকালীর বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, সে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

(৪)

প্রভাতে ব্রাহ্মণ চাল ডাল আনিয়া দিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "শীঘ্র করিয়া আহারাদি করিয়া লও, বুড়ো শিব দর্শন করিতে যাইব।" উমাকালী স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন, কিছু বলিতে সাহস হইল না।

আহারাদি করিয়া পত্নী, পুত্র ও কন্যাগণকে লইয়া রাধানাথ নৌকায় গিয়া উঠিলেন। উমাকালী দুর্গানাম জপ

করিতে করিতে নৌকায় ছইয়ের ভিতরে গেল। ব্রাহ্মণ ছইয়ের উপর বসিয়া রহিলেন।

উমাকালীর মনে নানারূপ চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল, একটা কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কিন্তু একটা যে কিছু গুরুতর কাণ্ড হইবে, উমাকালীর অন্তর তাহা বার বার বলিতে লাগিল। সে কায়মনে বিপদ্বারণ মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিয়া ছইয়ের উপর বসিয়াছিলেন, কোন দিকে দৃষ্টি নাই, নদীর তরঙ্গে নৌকা উঠিতেছে পড়িতেছে, মাথার উপর শ্বেতপক্ষ বকের দল উড়িয়া যাইতেছে, কৃষকবধূরা চুলে মাটী মাখিয়া হাঁ করিয়া নৌকার দিকে চাহিয়া আছে, ব্রাহ্মণের কোন দিকে লক্ষ্য নাই।

উমাকালী একবার নৌকার জানলার ফাঁক দিয়া দেখিল—একখানি খুব বড় নৌকা জমিদারের বজ্‌রার মতন নিশান উড়াইয়া তাহাদের নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তাহার ছইয়ের উপর চারি পাঁচ জন দরোয়ান সাজ পোষাক করিয়া বসিয়া আছে। নৌকাখানি দেখিয়া তাহার মনের ভিতর কেমন একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল এ নৌকাখানি তাহাদের পিছনে পিছনে আসিতেছে কেন? আবার মনে হইল, হয় ত কোন বড় লোক কোথায় যাইতেছে। কিন্তু তাহার মন কিছুতেই শান্ত হইল না। সে ভীত-দৃষ্টিতে নৌকা-

খানির প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহাদের নৌকাখানি একটা বাঁক ঘুরিয়া বড় একটা দীঘীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই বড় নৌকা হইতে সজোরে গভীর রোলে ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। উমাকালী ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না, সভয়ে বড় পুত্রটীকে বলিল—"একবার ওঁকে ডাক্।"

পুত্র পিতাকে ডাকিল, রাধানাথ ভিতরে আসিলেন না; উমাকালী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। দীঘীর চারিদিকে কলমীর লতা, মধ্যে মধ্যে শালুক ফুল, চতুষ্পার্শ্বে লোকের বাড়ী, সম্মুখে বাঁধা ঘাটের উপর একটা দেউড়ীওয়ালা প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী। উমাকালী কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বাঁধা ঘাটের ধারে আসিয়া নৌকা লাগিল, তীর হইতে শাঁখ ডঙ্কা ঢোল কাঁসি সানাই সরগোলে বাজিয়া উঠিল। উমাকালীর বুক শূন্য হইয়া গেল।

(৫)

রাধানাথ নৌকার ভিতরে আসিয়া উমাকালীকে বলিল—"ওঠ, এই খানে নামিতে হইবে।" ব্রাহ্মণের কণ্ঠতালু শুষ্ক।

উমাকালী ভীত ভাবে বলিল—"এখানে কি যে নামবো,

এতো বুড়ো শিবের মন্দির নয়।" উমাকালী দুই চারিবার স্বামীর সহিত বুড়ো শিবের মন্দিরে আসিয়াছিল।

রাধানাথ উদাসভাবে বলিল—"হ্যাঁ"। উমাকালী বলিল—"তুমি কি বলছো?" রাধানাথ বলিলেন—"হ্যাঁ এইখানেই নাম্‌তে হবে।"

উমাকালী বলিল—"কেন এখানে নাম্‌বো?"

রাধানাথ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিলেন—"ছেলে দিতে এসেছি।"

উমাকালী শিহরিয়া উঠিল, তাহার বুক দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল, সে অবাক্ হইয়া স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"ছেলে কাকে দেবো?"

রাধানাথ। রাজহাটের রাণী মাকে।

উমাকালী। কেন ছেলে দেবো?

রাধানাথ। সুখে থাক্‌বে, খেতে পাবে।

ব্রাহ্মণের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল।

উত্তেজিত ভাবে উমাকালী বলিল, "আমার ছেলে দুঃখেই মানুষ হবে, আমি ছেলে দেবো না।"

রাধানাথ বলিল, "না দিতেই হবে। গরীবের আবার ছেলে কি? দুঃখীর আবার ছেলে কি? যারা একমুঠো অন্ন দিতে পারে না, তাদের আবার ছেলে কি! দুঃখীর ছেলে

হ'তে নেই। দুঃখীর ছেলে থাকতে নেই।" উমাকালী মূর্চ্ছিত হইয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া গেল।

ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইলেন, একবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন। উমাকালী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "দাও আমার ছেলে আমার কোলে দাও, আমার ছেলে আমিই কোলে কোরে দেবো।" ব্রাহ্মণীর কোলে সন্তান দিয়া ব্রাহ্মণ নৌকার বাহিরে আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া কাহারও কথা বলিতে সাহস হইল না। রাধানাথ বলিলেন, পাল্কী আন সন্তানের মাতা নিজে গিয়া সন্তান দিবে।"

ধীরে ধীরে সন্তান কোলে লইয়া উমাকালী পাল্কীতে গিয়া উঠিল, চক্ষে এক ফোটাও জল নাই। অন্দরের উঠানে পাল্কী গিয়া দাঁড়াইল। রাজহাটের রাণী স্বয়ং ব্রাহ্মণীকে অভ্যর্থনা করিলেন। উমাকালী ধীরে ধীরে পাল্কী হইতে বাহির হইয়া সন্তান রাণীর হাতে তুলিয়া দিল। শিশুর রূপে গৃহ প্রাঙ্গণ আলোকিত হইয়া উঠিল। নবকুমারের মুখদর্শনীর দশহাজার টাকার মোহর, একটা বড় রুপার থালায় করিয়া দাসী লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। উমাকালী কোন দিকে চাহিল না, কোন কথা বলিল না। সাধ্বী পতির আজ্ঞায় সন্তান দান করিয়া পুনরায় পাল্কীতে আসিয়া উঠিয়া বসিল। স্তম্ভিত হইয়া রাজহাটের রাণী চাহিয়া রহিলেন।

অতীতের স্মৃতি

তখন আমি যুবক। "আরার" সন্নিকট একটী ক্ষুদ্র দুর্গ লইয়া আমরা ব্যতিব্যস্ত; দিবারাত্র দারুণ উদ্বেগ। আমরা গভীর উৎকণ্ঠা লইয়া বাস করিতেছিলাম। তখন সিপাহী-বিদ্রোহের প্রবল অগ্নি চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সকল স্থান অন্যায় হত্যা, অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ। আমরা প্রতিক্ষণে উন্মত্ত সিপাহীদিগের আক্রমণ অপেক্ষা করিতে ছিলাম।

পনের ষোলজন ইংরাজকর্ম্মচারী, একটি কামান ও এক রেজিমেণ্ট দেশী সিপাহীর উপর নির্ভর করিয়া আমরা নিজেদের প্রাণ ও মানরক্ষার সংকল্প করিতেছিলাম। আমার বন্ধু কাপ্তেন "লী" বয়সে প্রাচীন না হইলেও যথার্থ রণ-পণ্ডিত ও যোগ্য কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার শক্তি-সামর্থ্যের উপর আমাদের কাহারও অবিশ্বাস ছিল না।

দু একটি নিকটবর্ত্তী স্থানের বীভৎস-পরিণামের কথা তখন আমাদের "চা"এর টেবিলে আলোচনা হইতেছিল। প্রতীকারের কোন সামর্থ্য নাই, নিজেদের অক্ষমতা আমাদের দারুণ পীড়াদায়ক হইয়াছিল। তখন বেলা আটটা, দিনটা

ভাল নয়, শীতল বাতাস বহিতেছিল, খণ্ডমেঘে সূর্য্যরশ্মি আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

আমাদের সঙ্গে তিনটি মহিলা ছিলেন, তাঁহারা মোটা শাল গায়ে জড়াইয়া চেয়ারে সঙ্কুচিতভাবে আমাদের ভীষণ পরিণামের বিষয় উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন। তাঁহাদের সুন্দর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছিল।

এমন সময় বৃদ্ধ হাবিলদার রামরাম সিং আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ বিবর্ণ, দৃষ্টি ভীতিব্যঞ্জক। তাহার মুখভাব দেখিয়া আমরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় চিন্তিত হইলাম। কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাম রাম সিং, খবর কি?"

ভয়ে রামরাম সিংএর কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, অস্পষ্টস্বরে বলিল—"সিপাহীরা সকলে জটলা করিতেছে, ইহাদের মতলব ভাল নয়।"

কাপ্তেন বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"বল কি!" সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্টা মহিলারা ভয়ে কাঁপিতে ছিলেন। রামরাম সিং বলিল—"হাঁ হুজুর, বোধ হয় দুএক ঘণ্টার মধ্যেই তাহারা বিদ্রোহী হইবে।"

কাপ্তেন, রামরাম সিংহের সহিত বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আমি একটু মৃদু হাসিয়া মহিলাদিগকে বলিলাম,—"আপনাদের কোন চিন্তা নাই, আমরা যদি এই ক্ষুদ্র দুর্গটির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া সকলে বন্দুক চালাইতে পারি, তাহা হইলে বার চৌদ্দ ঘণ্টা দুর্গ রক্ষা করিতে পারিব। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের অন্য সাহায্যলাভের আশা আছে।"

কিছুক্ষণ পরেই কাপ্তেন ফিরিয়া আসিলেন। আমাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন। তাঁহার মুখে দারুণ উদ্বেগচিহ্ন। আমাকে বলিলেন,—"হেলি, আমাদের সর্ব্বনাশের অধিক বিলম্ব নাই, এখন "ডিস্‌আর্ম্‌" করিবার সময় নাই, আমি রসদ ও বারুদের ঘরের চাবি বন্ধ করিয়াছি। সেরূপ বিপদ্ ঘটিলে আমাদিগের প্রয়োজনীয় বারুদ রাখিয়া বাকি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। তোমরা সকলেই আশু বিপদের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক। আমাদের জন্য কোন চিন্তা ছিল না, কিন্তু সঙ্গে মহিলারা রহিয়াছেন, যেমন করিয়া হউক, তাঁহাদের রক্ষা করিতে হইবে।"

আমরা সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বে নিস্তব্ধতার মত নীরবে নিশ্চিত ভয়ানক বিপদের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। বারটা বাজিতেই সৈন্যনিবাসের দিক্ হইতে একটা কোলাহল শুনা গেল। আমরা দুর্গদ্বার বন্ধ করিলাম।

উন্মত্ত সিপাহীরা আমাদের দুর্গ লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতে লাগিল। রামরাম সিং কএকজন বাছা বিশ্বাসী সৈন্য লইয়া আমাদের দুর্গে থাকিবার অধিকার পাইয়াছিল। আমরাও গুলি চালাইতে লাগিলাম।

অতি ধীরভাবে কাপ্তেন আমাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। দুর্গ অভ্যন্তরস্থ সকলে ঘড়ির কাঁটার মত তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে লাগিল। এত গোলযোগে এই আসন্ন বিপদে কেহ কোনরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। কার্য্যশৃঙ্খলা দেখিয়া সে সময়ে আমি মনে মনে একটা পরম গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনটার সময় দুর্গের একটা অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। সকলেই একটা আশু বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইল বটে, কিন্তু কাপ্তেনের পরিচালনগুণে সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না।

ইঙ্গিতমাত্র ভগ্নস্থানে কামানটি স্থাপিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য একাকী আসে না, মুহূর্ত্তে আমাদের গোলন্দাজ সাহেবটি শত্রুর গুলিতে ধরাশায়ী হইলেন। রামরাম সিং সে স্থান পূর্ণ করিল। সে অদ্ভুত কৌশলে মুহুর্মুহু গোলাবৃষ্টি করিয়া আক্রমণকারী সিপাহীদিগকে অনেকটা নিরস্ত করিল বটে, কিন্তু আক্রমণকারীরা স্থানত্যাগ করিল না।

এই দেশীয় সিপাহীর অদ্ভুত রণকৌশল আমরা স্তম্ভিত ও বিস্মিতনেত্রে দেখিতেছিলাম। আমাদের রক্ষার জন্য তাহার প্রাণপাত চেষ্টা, তাহার জাতীয় মহানুভবতা, বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে! আমাদের পরম দুর্ভাগ্য, তাই এত চেষ্টা করিয়াও আমরা বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলাম না।

সিপাহীরা আবার গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। কাপ্তেন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"যেরূপ দেখিতেছি, আজ রাত্রে দুর্গ রক্ষা করা সুকঠিন। যদি একটি দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে পার, তাহা হইলে আমাদের রক্ষার উপায় হইতে পারে। এখান হইতে উত্তরে বিশ মাইলের মধ্যে একটি ইংরাজের ছাউনি আছে; কোনরূপে সেখানে সংবাদ পাঠাইতে পারিলে আমরা তাহাদিগের সাহায্য লাভ করিতে পারি।"

আমি বলিলাম—"তুমি যদি বল, আমি এখনই যাইতে প্রস্তুত আছি।" কাপ্তেন বলিলেন—"তুমি বীরপুরুষ, তোমার যোগ্য কথা বলিয়াছ, আমাদের দুর্গে একটি ভিন্ন দুইটি দ্বার নাই; তাহাতে বিদ্রোহী সিপাহীরা চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া আছে। কেহ বাহির হইলেই উন্মত্ত সিপাহীরা নেকড়ের দলের মত এক সঙ্গে আক্রমণ করিয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে।"

আমি নীরবে সমস্ত শুনিয়া বলিলাম,—"তা বলিয়া আর

উপায় কি ? মহিলাদিগকে রক্ষা করিতে গেলে ইহা করিতেই হইবে, তার পর ভগবানের ইচ্ছা।” ঠিক সেই সময়েই দুর্গপ্রাকার আবার খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

বিজয়দর্পে উন্মত্ত সিপাহীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। আমরা ছুটিয়া গেলাম, দেখিলাম, হাবিলদার রামরাম সিং কামানের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে। তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া গুলি প্রবেশ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে হাবিলদারের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। উৎকণ্ঠিতভাবে কাপ্তেন বলিলেন,—“হেলি, আর ত সময় নাই”।

আমি তাঁহার কথার অর্থ বুঝিলাম। কেল্লার ভিতরেই আমাদের কয়েকটা অশ্ব ছিল। আমি একটা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলাম। কাপ্তেন গম্ভীরভাবে বলিলেন,—“ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।” সকলেই তাঁহার প্রতিধ্বনি করিল। মহিলারা বিস্মিত ও কৃতজ্ঞভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গদ্বার একটু ফাঁক করিয়া দিতেই আমি অশ্বপৃষ্ঠে সজোরে কশাঘাত করিলাম। বলদৃপ্ত অশ্ব একলম্ফে শত্রুদিগের মধ্যে গিয়া পড়িল। উন্মত্ত সিপাহীরা আমার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমিও গুলি চালাইয়া পথ করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। একবার পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, অসংখ্য

সিপাহী আমার পশ্চাৎ ধাবন করিতেছে ও মুহুর্মুহু গুলি চালাইতেছে।

সিপাহীদিগের অশ্ব পরিশ্রান্ত থাকায় তাহারা অনেকটা পিছাইয়া পড়িল। দু একটা গুলি আমার কাণের কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। মহিলাদিগের বিমর্ষভাব আমার অন্তরে জাগিতেছিল। বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিব, এই আশার উৎসাহে আমি তখন স্বর্গীয়বলে বলীয়ান্।

সিপাহীদিগের গুলি আমার লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ মনে হইতে ছিল। হরীতকীবনের মধ্য দিয়া মৌয়াগাছের ছায়া দিয়া বন্ধুর ভূমির 'ভতর দিয়া আমার অশ্ব ছুটিতে লাগিল। সিপাহীরা কিন্তু আমার অনুসরণ ত্যাগ করিল না! ঘর্ম্মাক্ত, পরিশ্রান্ত অশ্ব এরূপভাবে আর কতদূর যাইতে পারিবে, আমি ভাবিয়া ব্যাকুল হইলাম।

উন্মত্ত সিপাহীরা ক্রমশঃ আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আমার অশ্বের গতিও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় আমি একটা বাঁক ঘুরিলাম। সম্মুখেই দেখি, ভুট্টার ক্ষেত্র। পক্ষিকুলকে ভয় দেখাইবার জন্য কএকটা খড়ের মনুষ্যমূর্ত্তি গড়িয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে, আমার মাথায় একটা

ফন্দি আসিল। আমি অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া নামিয়া পড়িলাম।

সেই একটা খড়ের পুতুল ঘোড়ার জিনের উপর বাঁধিয়া দিয়া আমার কোট ও টুপিটি তাহাতে পরাইয়া দিলাম। ঘোড়ার পায়ের শব্দে বুঝিলাম, সিপাহীরা নিকটে আসিয়াছে, বাঁক ঘুরিতে বিলম্ব নাই। আমি ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে সজোরে কশাঘাত করিলাম। বেদনা-কাতর অশ্ব ছুটিয়া পলাইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সিপাহীরা বাঁক ঘুরিয়া আসিল। আমি ভুট্টা-ক্ষেত্রের মধ্যে শুইয়া পড়িলাম।

অশ্বপৃষ্ঠে আমি আছি মনে করিয়া তাহারা আমার অশ্বের অনুসরণ করিল। আমি এই ভ্রম জন্মাইয়া দিয়া কতকটা আনন্দলাভ করিলাম, মনও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল; আমি আমার গন্তব্য পথাভিমুখে ছুটিয়া চলিলাম।

কিছুদূর ছুটিয়া গিয়া পথে একটা নদী পড়িল। নদীটি পার হইতে পারিলেই আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার আশা হয়। আমি নদীটি সাঁতরাইয়া পার হইব ভাবিলাম, কিন্তু এক নূতন বিপদ্ উপস্থিত হইল। অন্য একদল সিপাহী নদীর ধার দিয়া আসিতেছিল, এখনই তাহাদের চক্ষে পড়িব। কিন্তু কি করি, কোন উপায় নাই, আমি নদীর পাড় ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া উলুবনের অন্তরালে চলিতে লাগিলাম, তথাপি

সিপাহীদের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলাম না, তাহাদের মধ্যে একজন চীৎকার করিয়া বলিল—"ভেইয়া দেখ, একঠো সাব্ ভাগ্‌তা"। সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা আমাকে তাড়া করিল, আমি আত্মরক্ষার্থে দৌড়াইতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম নদীতে লাফাইয়া পড়িব, কিন্তু তাহারা তীর হইতে গুলি করিতে পারে ভাবিয়া সে বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলাম।

কিছু দূরে আসিয়া দেখিলাম, সম্মুখে একটী হ্রদ। তীর দিয়া পরপারে যাইবার একটী অতি সঙ্কীর্ণ পথ আছে। আমি বহুকষ্টে তীরবর্ত্তী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ধরিয়া হ্রদের প্রায় মধ্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এমন সময় মনে হইল, সিপাহীরা সেই হ্রদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আমি হ্রদের জলে লাফাইয়া পড়িলাম। হ্রদের মধ্যে নলবন, আমি মৎলব করিলাম, নল ফাঁপা, একটা মুখ ভাঙ্গিয়া দিলে অনায়াসে তাহার ভিতরের ছিদ্র দিয়া হাওয়া চলাচল করিতে পারে।

আমি একটি নলের মাথা ভাঙ্গিয়া নিম্নাংশ মুখে করিয়া জলে ডুবিয়া রহিলাম, নলের ঊর্দ্ধাংশ জলের উপরে রহিল। এইরূপে হাওয়া চলাচলের পথ থাকায় আমার কিছু অধিক-ক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকায় সুবিধা হইল। অনুসরণকারী সিপাহীগণ হ্রদতীরবর্ত্তী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া হ্রদ পার হইয়া গেল। তাহাদের ধারণা হইয়াছিল, আমি হ্রদের পর-

পারে চলিয়া গিয়াছি। সিপাহীরা চলিয়া যাইলে আমি হ্রদ হইতে উঠিয়া আমার গন্তব্য পথের নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নদী সাঁতরাইয়া পার হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। আমি নদীতে লাফাইয়া সাঁতরাইতে লাগিলাম। অনেক দূরে গিয়া নদীর একটা বাঁকের মুখে দেখিলাম, সুন্দর একটী ইউরোপীয় বালকের মৃতদেহ তীরবর্ত্তী জলজ লতায় আটকাইয়া আছে। তাহা দেখিয়া আর আমি অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

দেখিলাম বালকের বুকে একটি গাছের পাতা সেফ্‌টিপিন দিয়া আঁটা। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পাতাটি খুলিয়া লইয়া দেখিলাম, আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া তাহাতে লেখা আছে—"আমার ভগিনী ও মাতাকে আসিয়া রক্ষা করুন।"

বুঝিলাম, হতভাগ্য বালকের মাতা ও ভগিনী কোন দুর্গে সিপাহী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া আছে। বালকের এই আত্মীয়-রক্ষার্থে আত্মদান দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সে তাহার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। আমি লিখিত পত্রখানি সঙ্গে লইলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম বটে, কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সমস্ত উৎসাহ লোপ হইয়া গেল। হায়! যাহাদিগের নিকট সাহায্য লইতে আসিয়াছি,

তাহারাও আমাদেরই মত শত্রুপরিবৃত, আমাদেরই মত বিপন্ন।

নদীতীর হইতে দুর্গপ্রাকার পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র সিপাহী দুর্গটি ঘিরিয়া রহিয়াছে! তীর-বিটপীচ্ছায়ায় কতকগুলি অশ্ব সজ্জিত অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে, তাহাদিগের আরোহিবর্গ ঘাসের উপর শুইয়া বিশ্রাম করিতেছে।

আমার জানা ছিল, ইহার দশ মাইল দূরে আর একটি ইংরাজের ছাউনি আছে; সেখানে পৌঁছিতে পারিলে উপায় হইতে পারে। আমি সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলাম, দেখিলাম, গল্প করিতে করিতে সিপাহীরা নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি নব উৎসাহে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া একটি ঘোড়ার উপর লাফাইয়া উঠিলাম।

অশ্ব ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। অশ্বের পদশব্দে সিপাহীরা জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"পাকড়ো, পাকড়ো সাব্ ভাগ্‌তা হায়।" আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিপাহীরা ছুটিতে লাগিল!

কিছুদূর ছুটিয়া সুযোগমত সিপাহীদিগকে ঠকাইবার জন্য পূর্ব্ববারের মত আবার অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া বনের মধ্য দিয়া ছুটিতে লাগিলাম। সিপাহীরা আরোহিশূন্য অশ্বের পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিছুক্ষণ পরে দেখি, তাহারা আমার শূন্য অশ্ব ধরিয়া আনিয়াছে।

সীপাহীরা বন পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিল, ও অনবরত বনের ভিতর গুলি চালাইতে লাগিল। একটা গুলি আসিয়া আমার বাম হস্ত ভেদ করিল। আমি কোনরূপ যন্ত্রণার শব্দ করিলাম না,একটা ঝোপের পার্শ্বে পড়িয়া রহিলাম।

একটা সিপাহী খুঁজিতে খুঁজিতে সেই দিকে আসিল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে সিপাহিটী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, আমি একটী ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জ্জন শুনিলাম, আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, ভাবিলাম এত করিয়াও মহিলাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। ভারতের ভীষণ বিষধর সর্পের বিষয় অবগত ছিলাম। আমার পার্শ্বেই ক্রুদ্ধ সর্প, হয় ত সেই মুহূর্ত্তেই আমার সর্পদংশনে মৃত্যু হইবে; মৃত্যুতে আমার ভয় ছিল না, আমি সৈনিক পুরুষ, কিন্তু যাহাদিগকে রক্ষা করিতে আমি এত কষ্ট স্বীকার করিলাম, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, ভাবিয়া আমার মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

সিপাহীর চীৎকারে কতকগুলি সিপাহী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হতভাগ্য সর্পদষ্ট সিপাহীর তখন কথা বলিবার সামর্থ্য ছিল না। তাহাকে ধরাধরি করিয়া সকলে লইয়া গেল। আমি অতি সন্তর্পণে বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ রক্তস্রাবে আমি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া

পড়িলাম, তাহার সহিত দারুণ তৃষ্ণা। সে কি ভয়ানক তৃষ্ণা, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

অনেক কষ্টে একটী কুটীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বোধ হয়, কুটীরটী কোন দরিদ্র কৃষিজীবীর। আমি দ্বারের নিকটে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"ভগবানের দোহাই, আমায় একবিন্দু জল দাও।"

ষোড়শ বর্ষীয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা দরজা খুলিয়া দিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। সযত্নে বালিকা আমাকে খাটিয়ার উপর বসাইয়া তাম্রপাত্র বিশেষে একপাত্র জল খাইতে দিল। সে জল কত মধুর, কত তৃপ্তিদায়ক, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝিতে পারিবে না।

আমি জল পান করিয়া অনেকটা সুস্থ হইলাম। আমার ক্ষত দিয়া তখন রক্ত মোক্ষণ হইতেছিল। বালিকা ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিল। তাহার সে স্বর্গীয় আতিথ্যসৎকারে আমি মুগ্ধ হইলাম। তখন নেটিভদিগের উপর আমাদিগের বিষম জাতক্রোধ, কিন্তু বালিকার এই আশ্রিতের প্রতি যত্ন দেখিয়া আমার সে ভাব অনেকটা কমিয়া গেল।

বালিকার পরিধানে পায়জামা। গায়ে একটা লম্বা জামা, তাহার উপরে একখানা ওড়না। চোখে সুরমা। কিন্তু এই

সামান্য পরিচ্ছদেই বালিকার রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। আমার ক্ষতস্থান বাঁধিতে গিয়া বালিকার জামার খানিকটা রক্ত লাগিয়া গেল। আমি সঙ্কুচিতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। বালিকা একটু মৃদু হাসিল মাত্র।

ইহার কিছুক্ষণ পরে এক বৃদ্ধ আসিল, বালিকা তাহাকে গিয়া কি বলিল। বৃদ্ধ আমার নিকটে আসিয়া হাসিয়া বলিল—"সাহেব, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি এখানে থাক।" বালিকা ইত্যবসরে কিছু গরম দুগ্ধ আমাকে আনিয়া দিল, এবং কতকগুলি ক্ষেত্রজাত ফল আনিয়া ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া আমাকে দিতে লাগিল।

আমি তাহাদের সেবা ও যত্নে পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। এমন সময় বাহিরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা গেল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলাম, বালিকা ইঙ্গিতে আমাকে নিষেধ করিল।

বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া বালিকা কুটীরদ্বারের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বাহিরে সিপাহীরা কঠোরস্বরে দরজা খুলিবার আদেশ করিতে লাগিল; বৃদ্ধ কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

ইতিমধ্যে বালিকা আসিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিয়া

ডাকিয়া লইয়া চলিল। গৃহের পার্শ্বেই তাহাদের রান্নাঘরে রাশিকৃত কাষ্ঠ সংগ্রহ করা ছিল, কতকগুলি কাঠ সরাইয়া আমাকে তাহার ভিতর শুইতে বলিল। আমি নিঃশব্দে তাহাই করিলাম। আমার উপরে কতগুলি কাঠ চাপাইয়া ঢাকিয়া দিল, আমাকে আর বাহির হইতে দেখা গেল না।

আমি শুনিলাম সিপাহীরা বলিতেছে—"কৈ সাব্ হিঁয়া আয়া ?" বৃদ্ধ বলিল "কৈ নেই আয়া।" সিপাহীরা শুনিল না, তাহারা দরজা খুলিয়া দিতে আদেশ করিল।

বৃদ্ধ দরজা খুলিয়া দিলে সিপাহীরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরে আমার অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাহারা আমাকে পাইল না। রূপে অনেক সময়ে অনেক কাজ হয়। আমার বিশ্বাস, বালিকার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য সিপাহীদিগের অনুসন্ধানের পথে অনেকটা বিঘ্ন হইয়াছিল। অনুমানে বুঝিলাম, সিপাহীরা বিদায় হইবে, এমন সময়ে একজন সিপাহী বলিল, "তোমার জামায় রক্ত কেন ?" বালিকা কি বলিল বুঝিলাম না। সিপাহীরা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে বালিকা আমাকে কাঠের গাদা হইতে বাহির করিল। আমি তাহাদিগকে আমার জীবনরক্ষার জন্য ধন্যবাদ করিলাম। বালিকা ও বৃদ্ধ তাহাতে বড় লজ্জিত হইল।

আমি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, বালিকার বাম হস্তে ক্ষত, তাহা হইতে দর দর ধারায় রক্ত পড়িতেছে। তাহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, বালিকা তাহা বলিতে চাহে না, তুচ্ছ বিষয়ের মত হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

অনেক পীড়াপীড়ির পর বলিল,—"সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কাপড়ে রক্ত কেন? আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আপনার ক্ষতের রক্ত আমার কাপড়ে লাগিয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি খাটিয়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পিছনদিকে হাত করিয়া ছুরিখানি তুলিয়া লইয়া তাহাদের অলক্ষ্যে একটু হাত কাটিলাম, তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলাম, এই ক্ষতের রক্ত লাগিয়া থাকিবে। তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।"

আমি বালিকার এই অসামান্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, সে চক্ষু নত করিল। আমি কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম,—"তোমার এই আশ্চর্য্য উপস্থিতবুদ্ধিতে এই হতভাগ্যের প্রাণরক্ষা হইল। আমার প্রাণরক্ষার জন্য তুমি তোমার সুকুমার অঙ্গ-চ্ছেদন করিয়াছ, যদি আমাদের কখন সুসময় আসে তাহা হইলে একথা কখনও বিস্মৃত হইব না।"

কিছুক্ষণ পরে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

কিন্তু বালিকার সেই বিদায়-দৃষ্টি কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। তাহাতে এমন কিছু ছিল, যাহা মানুষে একবার দেখিলে জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

এবার আমি নিরাপদে আমার গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। সৈন্যসাহায্য যথেষ্ট পাইয়াছিলাম। মৃত বালকের কথা আমি ভুলি নাই। পথে তাহাদের দুর্গ হইতে বালকের মাতা ও ভগিনীকে রক্ষা করা হইল। শুনিলাম, সপ্তাহকাল শত্রু-সৈন্য এই দুর্গ বেষ্টন করিয়াছিল।

বালক তাহার মাতার নিকট গল্প শুনিয়াছিল। নদীর স্রোত নিকটবর্ত্তী দুর্গপ্রাকারের তলদেশ দিয়া গিয়াছে। যদি কোনরূপে একখানা চিঠি ভাসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের রক্ষার উপায় হয়। কিন্তু তাহাদের এ সুযোগ ছিল না। তাহারা নিত্যই মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিল।

বালক একদিন রাত্রিতে গুড়ি মারিয়া দুর্গের নর্দমা দিয়া নদীতীরে উপস্থিত হয় এবং বৃক্ষপত্রে ঐরূপ লিখিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহার ধারণা ছিল সে যদিও সাঁতরাইয়া যাইতে না পারে, কিন্তু তাহার মৃতদেহ ভাসিয়া নিশ্চয়ই দুর্গপ্রাকারে লাগিবে, তাহা হইলেই তাহার মাতার ও ভগিনীর জীবন রক্ষা হইবে।

বালকের এই অদ্ভুত আত্মত্যাগ বিশ্বের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। আমাদিগের দুর্গটিও কাপ্তেন অদ্ভুত রণ-কৌশলে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন; আমরাও ঠিক সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিয়াছিলাম।

তিনি আমাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। মহিলারা আমার বীরত্বের শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমি বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

যাহা হউক শীঘ্রই এ গোলযোগ মিটিয়া গেল। দেশ অনেকটা শান্ত হইল। কিছুদিন পরে একদিন কাপ্তেন বন্ধু বলিলেন,—"বন্ধুবর তুমি তোমার অপূর্ব্ব বীরত্বের পুরস্কার গ্রহণ কর। এই মহামান্য সুবর্ণপদক তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ"।

আমি নতজানু হইয়া তাহা মস্তকে স্থাপন করিলাম। বন্ধুবর তাহা আমাকে ধারণ করিতে বলিলেন। আমি সবিনয়ে বলিলাম,—"ইহার যথার্থ অধিকারী আমি নহি। যিনি ইহার ন্যায্য অধিকারিণী আমি তাঁহাকে ইহা দান করিব।"

কাপ্তেন বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সমস্ত তাঁহাকে বলিলাম। পরদিনই আমরা আমার আশ্রয়দাত্রী বালিকার কুটীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। বালিকা ও বৃদ্ধ আমাদিগকে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল ও সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিল।

আমি মৃদু হাসিয়া বালিকাকে দেখাইয়া বন্ধুকে বলিলাম—ইনিই এই মহামান্য পদকের যথার্থ অধিকারিণী। ইঁহার সাহায্য ব্যতীত আমাদের কাহারও জীবনরক্ষা হইত না। আমি সাদরে সেই সুবর্ণপদক বালিকার গলায় পরাইয়া দিলাম। সেই লজ্জাবনতা বালিকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমি আর জীবনে ভুলিতে পারিলাম না।

———

অন্দরে জুয়া

"কি ঠাকুর পো, আজ যে বড় স্ফূর্ত্তি ; নম্বর উঠেছে বুঝি" হাসিতে হাসিতে এক ষোড়শী এক অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবককে এই প্রশ্ন করিল। ভ্রাতৃবধূর প্রশ্নে দেবর নবীনচন্দ্র ঈষৎ লজ্জিত হইয়া উত্তর করিল,—"হ্যাঁ বৌদিদি, আজ সাত উঠেছে।"

উষা জিজ্ঞাসা করিল, "কত ধ'রেছিলে ?"

"তিন টাকা ; সাতে 'ন' টাকা দর ছিল, তিন নয় সাতাশ টাকা পাব।"

"আচ্ছা তোমাদের খেলার রকমটা কি বল'ত।"

"ভারি মজার খেলা, আমেরিকা ও আরও অপর অপর জায়গা থেকে তুলার রোজ একটা দর আসে, এখানে তারই ওপর খেলা হয়।"

"তা' যেন হয়। কালীঘাট থেকে আসবার সময় এক একটা দোকানে "তুলার খেলা" লেখা দেখেছি, একটা কাল সাইনবোর্ডে এক রকম কি ছাই নম্বর লেখা আছে, আবার তার পাশে পাশে আরও একটা নম্বর লেখা আছে, সেটা কিন্তু খড়ি দিয়ে লেখা।" সে গুলো কি ?

সে গুলো হ'ল টাকা, আটের পাশে যদি চার লেখা থাকে, বুঝ্‌তে হবে আট নম্বর উঠ্‌লে, আমি এক টাকা দিয়ে চার টাকা পাব।"

"নম্বর উঠ্‌বে কি রকম?"

"তুমি সেটা ঠিক বুঝতে পারবে না, তবে মোটামুটি কথাটা কি জান, পাঁচ জায়গা থেকে যে দর আসে, সেই সব দর নিয়ে, অঙ্ক ক'ষে একটা নম্বর বার করা হয়। যে নম্বরটা বেরুলো, সেই নম্বরটায় যদি তোমার টাকা ধরা থাকে, তাহ'লে তোমার জিৎ হলো। ধর—আট নম্বর উঠেছে, তুমি আট নম্বরে টাকা ধ'রেছ, আটে হয় ত এক টাকায় সাত টাকা দর ছিলো, তুমি এক টাকা দিয়ে সাত টাকা পেলে।"

বুঝেছি, বড় মজার খেলা ত! ধর, যদি আমি দশটা নম্বরেই দশ টাকা ধরি, তা' হলে ত একটা না একটাতেই টাকা পাবো।"

"তা পাবে, কিন্তু সব নম্বরে ত সমান দর থাকে না। দশ টাকা দিয়ে দশটা নম্বর ধর্‌লে, হয় ত সে দিন তিন নম্বর উঠল, তিন নম্বরে হয় ত পাঁচ টাকা দর আছে, পাঁচ টাকা লোকসান হ'ল।"

"তবে ত বুঝে ধরা বড় শক্ত।"

"হাঁ শক্ত বই কি, বুঝে দু তিনটে নম্বরে ধর্‌তে হয়; ওর সব হিসাব আছে। এক রকম ত নয়, ধারা দেখ্‌তে হয়, বেচান দেখতে হয়, বেড়ি দেখ্‌তে হয়, এর নানারকম অঙ্ক আছে। এই দেখনা আমি একখানা খাতা ক'রেছি। এ মাসে কোন্ নম্বরের পর কোন নম্বর এসেছে, কোন্ নম্বর ক'দিনের পর ক বার ঘুরেছে, এতে তার হিসাব আছে, বুঝ্‌তে হবে। ধর, চার সাত দিন পর পর এ মাসে চারদিন এসেছে, পাঁচ তিনবার এসেছে, হয় ত দেখা গেল ছয়ের পর চার প্রায়ই এসেছে, এই সব দেখে শুনে বুঝে দু তিনটা নম্বর ধর্‌লে প্রায়ই লোকসান হয় না।"

এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। "ঐ দাদা আফিস থেকে এলেন, আমি ভাই পালাই" বলিয়া নবীন চলিয়া গেল। উষাও ঘোমটা টানিয়া দিয়া অন্যদিকে গেল।

নবীনের দাদার নাম বিপিনচন্দ্র, সওদাগরী আফিসে কাজ করেন, খুব ভাল লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু ইংরাজি কথাবার্ত্তা বলিতে খুব পটু, কাজেই সাহেবদের প্রিয়. মেজাজ বড়ই রুক্ষ, বড়ই বদ্‌রাগী। বেশ মোটা মাহিনা পান, তাহাতে সংসার খুব সচ্ছলে চলিতে পারে, কিন্তু তিনি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় সঞ্চয়ী, সংসারের ব্যয়ের প্রতি খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

এখনও মাতা বর্ত্তমান, তাঁহার খিট্‌ খিটে স্বভাব, সর্ব্বদাই

বক্ বক্ করেন, তাহাতে হেতু অহেতু নাই। যদিও বিপিনচন্দ্র নিতান্ত কৃপণ ও স্বার্থপর, অত্যন্ত বদ্‌রাগী, শাশুড়ীরও খিট্‌খিটে স্বভাব, তথাপি উষার মিষ্ট ব্যবহারে সর্ব্বদাই তাহার উপর তাঁহারা আন্তরিক তুষ্ট।

নবীন লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে, পাড়ায় একটা থিয়েটারের আখড়া আছে, নবীনের সেখানে খুব বেশী গতায়াত, সে নূতন ইয়ারকি দিতে শিখিয়াছে। সিগারেটের প্যাক জামার পকেটে থাকেই, টেরীটী সব সময়েই কাটা থাকে, একটু আধটু লুকাইয়া ঢুকুঢুকুও চলে। নবীনের দাদা অনেক বার অনেক জায়গায় কাজকর্ম্মে লাগাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু সে কোথাও এক সপ্তাহের বেশী কাটাইতে পারে নাই, এজন্য নবীনের দাদা নবীনের উপর বড়ই বিরক্ত। নবীনও পারৎপক্ষে দাদার সহিত সাক্ষাৎ করে না, দেখা হইলে মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া যায়, এ সব দোষ থাকিলেও নবীনের অন্তর ভাল।

(২)

সন্ধ্যার সময় আলিসা দেওয়া ঘেরা ছাদে উষা যথন চুল বাঁধিতেছিল, নবীন হাসিতে হাসিতে সেখানে গেল। শশব্যস্তে

উষা গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কি ঠাকুর পো, আজকের খবর কি ?”

নবীন বলিল,—“খুব ভাল, আজ তিন নম্বরে দু টাকা, পাঁচ নম্বরে এক টাকা ধরেছিলুম। তিন উঠেছে, তিনের দর ছিল ন টাকা, আঠার টাকা পেয়েছি। পাঁচ নম্বরের এক টাকা বাদে সতের টাকা লাভ আছে।”

উষা হাসিয়া বলিল,—“বেশ ঠাকুরপো, কাল্‌কে আমার একটা টাকা ধ'রো না।”

নবীন বলিল,—“তা দিও না ; চারের কাল্‌কে খুব উঠ্‌বার আশা আছে। তুমি দিও, আমি চারে তোমার টাকা ধর্‌বো। দরও বেশ ভাল আছে, সাড়ে আট টাকা ক'রে।”

উষা নীচে গিয়া নবীনকে একটী টাকা আনিয়া দিল। নবীন বলিল,—“দেখ মা কি দাদাকে বলো না, তা হলে বড় বক্‌বেন্।”

উষা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন ?”

নবীন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—“কি জান ওঁরা বলেন জুয়া খেল্‌তে নাই।” উষা ভীতভাবে বড় বড় চোখ দুটী তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“তবে তুমি খেল কেন ?”

নবীন। তুমি ত জান আমি লুকিয়ে খেলি, দাদা শুন্‌লে কি রক্ষা রাখ্‌তো !

উষা গম্ভীরভাবে বলিল,—"দেখ ওঁরা যখন বারণ করেন, তবে তুমিও আর ও খেলা খেলো না।"

নবীন হাসিয়া বলিল,—"তুমিও যেমন, ওঁরা ভাবেন খেলে হেরে যাব। এমন লাভ ক'রেছি শুন্‌লে হয়ত বারণ কর্‌তেন না।"

উষা। তবে বল্‌তে ভয় পাচ্ছ কেন?

নবীন। ভয় নয়, এতদিন বলিনি, এখন বল্‌লে হয়ত কি ভাব্‌বেন, তাই কিছু বলিনি।

উষা। সত্যি ঠাকুরপো, এতে কিছু দোষ নেই ত?

নবীন। কিছু না, আমরা কি চুরি কচ্ছি? এ বরাতের খেলা। আমরা বরাতঠুকে একটা নম্বর ধর্‌বো, যা বরাতে থাকে হবে; তুমি ও সব কথা কিছু ভেবো না।

উষা। তা বটে, ও বাড়ীর মুখুয্যেদের ছোটবউও বেয়ারার হাত দিয়ে খেলে; মন্দ হ'লে তারা খেল্‌বে কেন? আমাকেও ক'দিন খেল্‌তে বলেছিল।

নবীন। ঐ বোঝ না, তুমি যেমন মিছামিছি ভাব।

নবীন টাকাটী লইয়া চলিয়া গেল। পরদিন সাড়ে আটটী টাকা আনিয়া বৌদিদিকে দিল। সেইদিন হইতে উভয়ে লুকাইয়া লুকাইয়া তুলার খেলা খেলিতে লাগিল।

খেলার নেশা বড় নেশা। ঘরবাড়ী বেচিয়া লোকে জুয়া

খেলে। এ চুম্বকের আকর্ষণ। তাহাতে নবীন ও উষার অল্প বয়স, সংসারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। জুয়ার পড়্তা প্রায় প্রথমে সকলেরই ভাল পড়ে, লোকেও পাগল হয়, পরিণাম ভাবিবার অবসর থাকে না।

নবীন ও উষারও পড়্তা ভাল। প্রায় প্রত্যহই তাহারা জিতিতে লাগিল। খেলার টাকার মাত্রাও এখন ১০।২০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বাড়ীতে কেহই এ তত্ত্ব জানে না।

(৩)

একদিন নবীন বলিল,—"দেখ বৌদিদি, বেঁধে খেলা যাক, অনেক টাকা একসঙ্গে পাওয়া যাবে।"

উষা জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কেমন ঠাকুরপো!"

নবীন বলিল,—"দেখ চার ওমাস থেকে আসেনি, এ মাসের আজ দশ তারিখ। এ পর্য্যন্ত দেখা গেছে কোন নম্বরই ৪৮ দিনের বেশী ঘুর্‌তে দেরী করে না, আর আট দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই চার ঘুর্‌বে। আজ থেকে আমরা রোজ ৪ বেঁধে খেল্‌বো। ধর আজ যদি চারে দিই একটাকা, কাল দেবো দু টাকা; এমনি করে যতদিন চার না আস্‌বে দুনো ক'রে ধরবো।"

উষা বলিল,—"যদি আটদিন আস্‌তে চায়ের দেরী হয়, তা হলে আমাদের কত টাকা দিতে হবে ?"

নবীন বলিল,—"কতটাকা আর—"

সে একখানি নোটবুক বাহির করিয়া ১+২+৪+৮+১৬ +৩২+৬৪+১২৮=২৫৫) হিসাব করিয়া বলিল—"২৫৫৲ টাকা।"

চমকিত হইয়া উষা বলিল—"এত টাকা কোথা পাব ?" নবীন বলিল,—"সত্যি সত্যি কি আর ৮ দিন দেরী হবে ? আর আমাদেরও ত প্রায় দুশো টাকা জমেছে। গোটা পঞ্চাশ টাকা কি আর যোগাড় হবে না।

উষা বলিল, "কোথেকে যোগাড় হবে ?"

নবীন বলিল—"দাদার টাকা ত তোমার কাছে থাকে, তা থেকে ধার নেবে, টাকা পেলেই আবার রেখে দেবে।"

উষা ভীতভাবে বলিল,—"না ভাই, তা আমি পার্‌বো না। কখন তিনি টাকা চাইবেন তা কি বলা যায় ? তখন যদি দিতে না পারি কি ভাব্‌বেন বল ত ?"

বিমর্ষভাবে নবীন বলিল,—"তাই ত ! তবে কি ক'রে আর বেঁধে খেলা হয়। কিন্তু বেঁধে খেল্‌তে পার্‌লে লাভ হতো। আমরা আটদিনে ২৫৫ টাকা দিতুম, কিন্তু পেতুম কত জান ? চায়ের দর আছে আট টাকা। যদি কদিনে খুব নামে সাত

টাকার বেশী নাম্‌বে না। সাত টাকা ছেড়ে দাও, ছয় টাকা হিসাবে ধরলেও ১৫৩০ টাকা হয়। তা থেকে ২৫৫৲ টাকা বাদ দিলে তবু ১৩০৫৲ টাকা থাকে।"

এতগুলি টাকা একসঙ্গে পাওয়া যাইবে শুনিয়া উষার বুকের ভিতর একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বামীর তহবিল হইতে টাকা লইতে হইবে ভাবিয়া অনেক কষ্টে সে দুর্দ্দমনীয় লোভ দমন করিয়া বলিল,—"তা আর কি কচ্ছি বল।"

নবীন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—"চারেই টাকা দেওয়া যাক, অন্য নম্বরেও দু একটা ক'রে টাকা দিতে থাকি। দেখা যাক্, যদি মাছের তেলে মাছ ভাজা যায়।" নবীন চিন্তিতভাবে চলিয়া গেল।

নবীন সেই হিসাবে চার বাঁধিয়া খেলিতে লাগিল। চারি দিনের মধ্যেই চার ফিরিয়া আসিল। টাকাগুলি হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে গিয়া উষাকে বলিল,—"এই তুমি কত ভাব্‌ছিলে, চারদিনের মধ্যে চার ঘুরে এল, এই টাকা নাও।"

একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা। আনন্দে উষা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নবীন বলিল,—"আমরা কি আনাড়ী খেলোয়ার? যা বল্‌বো ঠিক হবে। আর তুমিই বল না ভাই, আমরা হেরেছি কবে?"

উৎসাহে উষা বলিল,—"তা ঠিক তুমি বেশ খেলো।"

অনেকগুলি টাকা হাতে পাইয়া নূতন উৎসাহে তাহারা ফিগার বাঁধিয়া খেলিতে আরম্ভ করিল। নবীন অনুমান করিয়াছিল, ফিগারটি অন্যূন আট দিনের ভিতর নিশ্চয় ঘুরিয়া আসিবে। কিন্তু হায়, দশ দিন গেল ফিগার ঘুরিয়া আসিল না, হাতের টাকা ফুরাইয়া গেল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বামীর তহবিল হইতেই উষা লুকাইয়া লুকাইয়া টাকা দিতে লাগিল। মনে প্রবোধ দিল, টাকা ত আর মারা যাচ্ছে না, পেলেই আবার রেখে দেবো।

ঘটনাচক্রে সেই মাসেই উষার ছোট ভগিনীর বিবাহ। উষাকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার পিতা আসিয়া উষার শ্বাশুড়ীকে বলিয়া গেলেন। পিত্রালয়ে যাইবার দিন উষা নবীনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ঠাকুরপো, এবার ত বড় বিপদে পড়্লুম্। আর দুদিনের টাকা কোন রকমে ওঁর তহবিল হইতে নেওয়া চল্‌বে, তারপর তাঁর তহবিলও শূন্য।"

নবীন বলিল,—"ভয় কি বৌদিদি, খুব সম্ভব কালই নম্বর ঘুর্‌বে, তুমি কোন চিন্তা ক'রো না। আমি কালই তোমার বাপের বাড়ীতে টাকা নিয়ে হাজির হব।"

বিবাহের পর দিনই আসিবার অঙ্গীকারে উষা শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পিতার সহিত গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

(৪)

বিবাহ-বাড়ীর নহবত বাজিয়া বাজিয়া একটু থামিয়াছে। নবীন আসিয়া ডাকিল,—"বৌদিদি!" উৎকণ্ঠিতা উষা বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠাকুরপো, নম্বর এসেছে"?

বিমর্ষভাবে নবীন বলিল,—"না।"

হতাশভাবে উষা বলিল,—"আমার হাতে ত আর একটি পয়সাও নাই।"

নবীন বলিল,—"যে কোন রকমে আর দুটো একটা দিন টাকা দিতেই হবে। টাকা বন্ধ কর্‌লেই সর্ব্বনাশ, আমাদের সব টাকা মাটি।"

উষা বলিল,—"তাই ত ঠাকুরপো কি হবে, আর তাঁর টাকা নিয়েছি, তিনিই বা কি বল্‌বেন!" উষা কাঁদিতে লাগিল।

চিন্তিত ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নবীন বলিল,—"একটা উপায় আছে, নইলে আমরা একেবারে মজ্‌বো। তোমার গহনাগুলো বন্ধক দিই, তাতে আমাদের দুদিনের টাকা দেওয়া চল্‌বে। এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।"

উষা বলিল,—"এ বে বাড়ীতে গায়ের গহনা বাঁধা দিলে সকলে যে টের পাবে"।

নবীন বলিল—"এ ছাড়া আর উপায় কি! আর এ টাকা গুলো যদি যায়, দাদাকেই বা কি জবাব দেবে? আর এ কথা প্রকাশ হ'লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? আমাকেও বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে, তোমারও লাঞ্ছনার সীমা থাক্‌বে না।"

উষা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তাই না হয় নিয়ে যাও, অদৃষ্টে যা আছে হবে।" সমস্ত অলঙ্কারগুলি খুলিয়া উষা নবীনকে দিল। নবীন অলক্ষ্যে চোরের মত গহনাগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

উষা অসুখের অছিলায় বিছানায় গিয়া শুইয়া রহিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই যে শুয়ে রইছিস্, অসুখ করেনি ত!" উষা যন্ত্রণার ভাব করিয়া বলিল,—"বড্ড অসুখ কর্‌ছে, মাথার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে"।

মাতা বলিলেন,—"তাইত বাছা কাজ কর্ম্মের বাড়ী, তাতে তোমার অসুখ ক'ল্লে! যাই দেখি কর্ত্তাকে বলি"।

উষা বাধা দিয়া বলিল,—"না মা বাবাকে বল্‌তে হবে না, একটু ঘুমুলেই বোধ হয় সেরে যাবে।"

"তবে বাছা একটু ঘুমোও" বলিয়া মাতা চলিয়া গেলেন।

উষা শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, "কি অন্যায় কাজই ক'রেছি, কেন এ খেলা খেল্‌লেম। এই জন্যই জুয়া খেল্‌তে গুরুজনেরা বারণ করেন। যদি দুদিনের ভেতর নম্বর না

আসে”—উষা আর ভাবিতে পারিল না। তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

বিবাহের বাড়ী গণ্ডগোলে দু এক জন দু একবার আসিয়া উষাকে ডাকিল। উষা “বড় অসুখ ক’রেছে” বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে নবীন সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সংবাদ ভাল নয়, সে দিনও নম্বর আসে নাই। উষা সমস্ত দিন আহার করিল না, বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। সমস্ত দিন গেল, রাত্রি আসিল। বড় যন্ত্রণায় উষার সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

(৫)

সকাল বেলা উষা জানালার ধারে বসিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে নবীনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এই আসে এই আসে করিয়া দশটা বাজিয়া গেল, নবীন আসিল না। উষার দৃঢ় ধারণা হইল নিশ্চয়ই নম্বর উঠে নাই, তাই হয়ত ঠাকুরপো লজ্জায় আস্‌ছে না। উষার বুকের ভিতর হুহু করিতে লাগিল, তাহার মাথার ভিতর ঘুরিতেছিল। সে জানালার উপর মাথা রাখিয়া বাহিরের হাওয়ায় শীতল হইবার চেষ্টা করিল।

তাহার শ্বাশুড়ী ও স্বামীর কথা মনে করিয়া সে আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে বেশ জানিত, তাহার স্বামী ও শ্বাশুড়ী

যে প্রকৃতির, তাঁহাদের নিকট এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। সেই প্রভাতের শীতল বাতাসেও তাহার সমস্ত অঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। উষা ভাবিতেছিল, হায় কি হইবে! প্রলোভনে পড়িয়া এ কি সর্ব্বনাশ করিলাম। বাড়ীতে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব। অলঙ্কার পরিয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছে, সে অলঙ্কার লইয়া না গেলে স্বামী কি ভাবিবেন, শ্বাশুড়ী কি বলিবেন! হয়ত তাঁহারা মনে করিবেন তাহার পিতামাতা কন্যাদায়ে তাহার অলঙ্কার বন্ধক দিতে বাধ্য হইয়াছেন। সে শতসহস্র বৃশ্চিকযন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল।

সাধারণতঃ স্ত্রীলোক পিতামাতার অপমান সহ্য করিতে পারে না, সে পিতামাতার এই মিথ্যা কলঙ্কের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই দারুণ কলঙ্কস্খালনের উপায় কি? কোন উপায় সে স্থির করিতে পারিল না।

আজ তাহার মনে হইল লজ্জা-কলঙ্ক-বিদ্বেষবর্জ্জিত এমন একটা আশ্রয় আছে, যেখানে ভুলের জন্য কেহ উপদেশছলে মর্ম্মপীড়া দেয় না। যথার্থ সহানুভূতির আবরণে লুক্কায়িত নিজের জ্ঞান বিজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য ব্যগ্র হয় না। ভৎসনার জন্য আত্মীয়তার আবরণ গায়ে দেয় না, আজ সে পরলোকের সহিত নিজের একটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করিতে লাগিল।

এ সংসার আজ সে বন্ধুবান্ধবহীন অরণ্যময় দেখিতে লাগিল, স্থান নাই, আশ্রয় নাই। আজ তাহার মনে হইল, মৃত্যুই তাহার একমাত্র বন্ধু, সে সেই পরম বন্ধুর নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে বিছানায় পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। সে স্থির করিল পিতার আফিমের কৌটা হইতে আফিম লইয়া আত্মহত্যা করিয়া পিতামাতার এ কলঙ্ক দূর করিবে।

সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পিতার আফিমের কৌটা হইতে আফিম চুরি করিয়া লইয়া আসিল, কিন্তু আফিম আনিয়াও তাহা খাইতে পারিল না, তাহার স্বামীর মুখখানি মনে পড়িতে লাগিল। নারীর অহেতুক প্রেম, পতির কোন ক্রুটী সাধ্বী দেখিতে পায় না, স্বামী যেমনই হ'ন না কেন, সতী তাঁহাকে কায়মনে ভালবাসে। বঙ্গরমণীর প্রেমের এই বিশেষত্ব। তাহারা নিজের ক্রুটী দেখিতে পায়, স্বামীর ক্রুটী দেখা অভ্যাস করে না। উষাও হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর বউ, সে একবার পতিকে না দেখিয়া মরিতে পারিল না।

সেই দিনই তাহার শ্বশুর-বাড়ী যাইবার কথা ছিল, শ্বশুর-বাড়ীর ঝি লইতে আসিল। উষা আফিম টুকু লুকাইয়া সঙ্গে লইয়া পিতামাতাকে গিয়া প্রণাম করিল, সে জানিত, এই বিদায়ই তাহার শেষ বিদায়। সে পরম ভক্তি ও প্রেমের

সহিত পিতামাতার পদধূলি লইল, পিতামাতা তাহার মনের ভাব জানিতেন না, কিন্তু কন্যার সেই ছল ছল দৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রাণেও কেমন একটা হতাশ্বাস জাগিয়া উঠিল, কেমন একটা বুকের ভিতর আঘাত অনুভব করিলেন, তাঁহারা অন্তর্বৃত্তির নিহিত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন না, কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে যে ভাব হয় তাহাই অনুমান করিলেন। উষা বাড়ীর ঝি, চাকর, আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাল্কীতে গিয়া উঠিল।

তখন বেলা ৫টা বাজে নাই, উষা পাল্কী হইতে নামিয়া একখানি চাদরে সমস্ত অঙ্গ জড়াইয়া শ্বাশুড়ীকে গিয়া প্রণাম করিল। শ্বাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বউমা গায়ে কাপড় দিয়েছ কেন?" সংক্ষেপে উষা বলিল—"শরীর ভাল নয়।" শ্বাশুড়ী ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"ঐ জন্য ত কোথাও নিমন্ত্রণ যেতে বলি না, বাড়ী থেকে বেরুলে ধিঙ্গি হও, এখন প'ড়ে প'ড়ে ভোগ, ডাক্তার আসুক্ ওষুদ দিক্, তা তোমার কি লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন" এইরূপ বকিতে বকিতে শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন। পাছে নিরাভরণা অবস্থা শ্বাশুড়ী দেখিতে পান, এজন্য উষা গায়ে চাদর জড়াইয়া ছিল। উষা ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পাঁচটায় সময় বিপিনচন্দ্র আফিস হইতে ফিরিলেন। শয়ন-

কক্ষে গিয়া দেখেন উষা শুইয়া আছে। বিপিনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে বড় শুয়ে র'য়েছ।"

উষা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—"অসুক ক'রেছে।" তাহার পর সে স্বামীকে প্রণাম করিয়া অতি ভক্তিভাবে পদধূলি গ্রহণ করিল, মনে মনে স্বামীর নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিল। বিপিনচন্দ্র কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে গেলেন।

(৬)

আর কি, উষার সব সাধ পূর্ণ হইয়াছে, মরিতে আর ভয় কি! সে লুকায়িত আফিম বাহির করিল,আফিমটি হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিল,—'কে বলে তুমি বিষ, অবলার তুমি সুধা অপেক্ষাও প্রিয়; যাহার কেহ নাই তাহার তুমি আছ, যে যন্ত্রণা যে জ্বালা মানুষে দূর করিতে পারে না, তোমার স্পর্শে অচিরে তাহা দূর হয়, হে প্রিয়, হে বন্ধু, দুঃখীর তুমি বড় আপনার, দুঃখীর দুঃখ তুমিই বুক পাতিয়া লও, তুমি বিষ নও অমৃত।'

এমন সময় তাহার স্বামীর কর্কশ কণ্ঠ উষার কর্ণে প্রবেশ করিল, স্বামী বলিতেছেন—"তুই এ সব গহনা কোথা পেলি?"

উৎকর্ণ হইয়া উষা উঠিয়া দাঁড়াইল, কোন উত্তর নাই। স্বামী আবার গর্জ্জিয়া বলিলেন,—"নিশ্চয় তুই চুরি করিয়াছিস্।"

উষার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, নম্বর উঠিয়াছে। ঠাকুরপো গহনা ছাড়াইয়া আনিয়াছে। সে দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া শুনিতে লাগিল। বিপিনচন্দ্র তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। নবীন কিন্তু একটীও কথা বলিতেছে না, ক্রমশঃই বিপিনচন্দ্রের ক্রোধ বাড়িতেছে, ক্রোধে ভ্রাতাকে প্রহার করিলেন। তথাপি নবীন নীরব।

স্বামীর ক্রোধ কিরূপ ভীষণ উষা তাহা বিশেষরূপে জানিত, মার্জ্জনা কাহাকে বলে বিপিনচন্দ্র জানিতেন না, ক্রোধের সময় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইতেন। কর্কশ স্বরে নবীনচন্দ্র বলিলেন,—"তুই কত বড় পাজি আমি দেখ্‌ছি, বল্ গহনা কোথায় পেলি, নয়ত তোরে মেরেই ফেলবো।"

বিপিনচন্দ্র সজোরে নবীনকে ধাক্কা দিলেন, দেওয়ালে মাথা ঠোকায় ভীষণ 'শব্দ উষা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

গোলযোগে উষার শাশুড়ী সেইখানে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন,—"ওমা কি হতছাড়া বউগো, হাড়হাবাতির মেয়ে, গহনাগুলো সাবধান ক'রে রাখ্‌তে পারেনি, ভাগ্যি ঘরের ছেলে নিয়েছিলো। তাইত পাওয়া গেল, যদি চোরে নিত! আর হতচ্ছাড়া ছেলে তোরও শেষে এই জ্ঞান হলো।"

নবীনের মুখে কোন কথা নাই। গর্জ্জিয়া বিপিনচন্দ্র

বলিলেন—"কথার যে জবাব দিচ্ছিস্ নি, কতক্ষণ কথার জবাব না দিস্ আমি দেখ্‌ছি। রামদীন পাহারাওয়ালা ডাক্‌তো, দিনকতক ঘানি না টান্‌লে তুই দোরস্ত হবি না। তিন চারবার আফিসে কাজ ক'রে দিলুম, তা কাজ কর্ব্বে কেন—থিয়েটার! পয়সার ত দরকার এখন ঘরের চুরি ক'চ্ছে, শেষে পরের চুরি কর্‌বে।"

বিপিনচন্দ্র যাহা একবার মুখ দিয়া বাহির করেন, তাহার অন্যথা হয় না। তিনি অক্লেশে ভাইকে পুলিশে দিতে পারেন, ঊষার তাহা দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। বেহারা রামদীন আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতাও পুত্রের স্বভাব জানিতেন, তিনি কাঁদিয়া বলিলেন,—"কি ছোট লোকের মেয়ে ঘরে এনেছিলুম গো, আমার দুধের ছেলের হাতে দড়ি দেওয়ালে।"

বিপিনচন্দ্র রামদীনকে বলিলেন—"দেখছিস্ কি, যা মোড় থেকে পাহারাওয়ালা ডেকে আন; ও দিনকতক জেল না খাট্‌লে ঠিক হবে না, অল্পেতে শাসন না হ'লে কালে ও ভয়ানক হবে।" রামদীন পুলিশ ডাকিবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিল।

ঊষার মনে হইল, আমার জন্য ঠাকুরপোর এই যন্ত্রণা, আমি কেন তুলার খেলায় যোগ দিয়েছিলুম, আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে, আমি সব কথা খুলে বল্‌বো।' তাড়া দিয়া বিপিনচন্দ্র

রামদীনকে বলিলেন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন—"যা পাহারাওয়ালা ডেকে নিয়ে আয়।"

অবগুণ্ঠিতা উষা মুহূর্ত্তমধ্যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল,—"আমি ঠাকুরপোকে গহনা দিয়াছি, তার কোন দোষ নাই।" আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা উষা খুলিয়া বলিল।

আরক্তলোচনে বিপিনচন্দ্র বলিলেন,—"যে স্ত্রীলোক গায়ের গহনা বেচে জুয়া খেলে, আমি তেমন স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে চাই না, আমি তোমাকে পরিত্যাগ কল্লুম্।" ক্রোধ-কম্পিত বিপিনচন্দ্র দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

মৃতের মায়া

বৃহস্পতিবার সৌমেন্দ্র আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিল, এমন সময় একখানি টেলিগ্রাম আসিল। তাহাতে লেখা আছে "ছোট বউ কলেরায় আক্রান্ত, তুমি সত্বর বরফ লইয়া আইস।"

টেলিগ্রামের প্রতি অক্ষর তাহার হৃৎপিণ্ডে আঘাত করিতে লাগিল। সৌমেন্দ্র মাতালের মত টলিতে টলিতে বড় বাবুর টেবিলের উপর টেলিগ্রামখানি রাখিয়া হতাশভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

বড়বাবু একখানি চিঠির খসড়া করিতেছিলেন। ক্ষুদ্র কুটিল দুইটি চক্ষু চসমার অন্তরাল হইতে সৌমেন্দ্রের মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া ঈষৎ বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"ব্যাপার কি?"

সৌমেন্দ্র নীরবে টেলিগ্রামখানি তাঁহার হস্তে দিল। বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক টেলিগ্রামখানি পড়িয়া বড়বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তার আর হয়েছে কি? বাড়ী যাবার সময় কিছু বরফ সঙ্গে নিয়ে যেও।"

সৌমেন্দ্র বলিল—"না, আমাকে এখনি যেতে লিখ্‌ছে, এ সব ব্যামোর কথা কিছু বলা যায় না। আমাকে এখনি যেতে

হবে; আপনি অনুগ্রহ ক'রে সাহেবকে ব'লে আমায় ছুটী করিয়ে দিন।"

বড়বাবু বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এই ত সবে বারটা, তাতে আজ মেল ডে; আমি এ কথা কেমন ক'রে সাহেবকে বলি।"

কাতরভাবে সৌমেন্দ্র বলিল,—"আমার এই বিপদ্, আপনি দয়া না কর্‌লে বোধ হয় শেষ দেখা"—সৌমেন্দ্র আর কথা বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বড়বাবু তেমনি স্থিরভাবে বলিলেন,—"তা আমি কি কর্‌বো, তোমাদের এ সব অন্যায় আব্দার। অসুখ ক'রেছে সেরে যাবে, আর ক ঘণ্টা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচটা বেজে যাবে এখন। বরং তোমার হাতের কাজগুলা তাড়াতাড়ি সেরে ফেল। কাজে থাক্‌লে মন অনেকটা শান্ত হবে।"

অধীরভাবে সৌমেন্দ্র বলিল,—"না, আমি স্থির হতে পাচ্ছিনি, আপনি যদি সাহেবের কাছে যেতে না পারেন, অনুমতি করুন, আমি নিজে যেয়ে সাহেবকে বলি।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে বড়বাবু বলিলেন—"তা, বেশ ত যাও না, কে তোমায় ধ'রে রেখেছে।"

সৌমেন্দ্র কথার কোন উত্তর না দিয়া সাহেবের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। বড়বাবু অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বড়বাবুটি ভাল লেখাপড়া জানিতেন না। ঘেঙ্গাইয়া কোন রকমে কাজচলা গোছ ইংরাজী বলিতে পারিতেন। তাহার ভিতর "মাই লর্ড, সার ও বেগ ইওর পার্ডনের" ছড়াছড়ি থাকিত। সর্ব্বদা আশঙ্কা, সাহেবের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে বলিয়া কে কখন সাহেবের মন ভারি করে। তাই সহজে কাহাকেও সাহেবের নিকট যাইবার অবসর দিতেন না।

সৌমেন্দ্র বরাবর সাহেবের ঘরে গিয়া দেখে বড় সাহেব নাই, ছোট সাহেব বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। সৌমেন্দ্র অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব সৌমেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবু, তোমার কি প্রয়োজন?" সৌমেন্দ্র সাহেবের হাতে টেলিগ্রামখানি দিল।

সাহেব টেলিগ্রাম পড়িয়া উৎকণ্ঠিতস্বরে বলিলেন,—"বাবু, টেলিগ্রাম কতক্ষণ পাইয়াছ?"

সৌমেন্দ্র। সাড়ে এগারটার পর।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া সাহেব বলিলেন,—"অনর্থক এত বিলম্ব করিয়া ভাল কর নাই, টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র আমার নিকট আসা উচিত ছিল।"

সৌমেন্দ্র বলিল,—"সাহেব আমরা পেটী কেরাণী। বড়বাবু ঘন ঘন আপনাদের নিকট আসা যাওয়া পছন্দ করেন না। আমি প্রথমে বড়বাবুকে টেলিগ্রাম দেখাই। তিনি আমার

ছুটীর প্রার্থনায় আপনার নিকট আসিতে অস্বীকৃত হওয়ায় আমি নিজেই আপনার সহিত দেখা করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

সাহেব বড়বাবুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন,—"ব্রুট, বড়বাবু পশুর মত ব্যবহার করিয়াছে; উত্তম, তুমি এখনি বাড়ী যাও। যে কয়েকদিন তোমার স্ত্রী অসুস্থ থাকেন, তোমাকে ছুটী দিলাম, আশা করি তোমার স্ত্রীর আরোগ্যসংবাদ পাইব।"

কৃতজ্ঞতার সহিত সৌমেন্দ্র সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। সাহেব ডাকিয়া বলিলেন,—"বাবু শোন, বোধ হয় চিকিৎসা করিতে তোমার অনেক ব্যয় পড়িবে, তোমাকে আমি এই একশত টাকা দিতেছি লইয়া যাও। আমার এই সামান্য সাহায্য তোমার উপকারে আসিলে আমি পরম সুখী হইব।"

বিস্মিত কৃতজ্ঞতা-মণ্ডিত চক্ষে সৌমেন্দ্র সাহেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সাহেব বলিলেন—"দেরি করিও না, এখনি যাও। তোমার স্ত্রীর চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি হয় না। যদি তোমার আরও অর্থের প্রয়োজন হয়, টেলিগ্রাম করিও, আমি তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিব।"

সৌমেন্দ্রের তখন মনে হইতেছিল, বড়বাবুর মত স্বদেশী আমার আপনার, না এই সুদূর শ্বেতদ্বীপবাসী আমার আপনার?

তাড়াতাড়ি পনের সের বরফ লইয়া সৌমেন্দ্র হাঁফাইতে হাঁফাইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিল! তখন গাড়ী ছাড়িতে অল্প বিলম্ব আছে। সৌমেন্দ্র ডেলিপ্যাসেঞ্জার, শ্যামনগর হইতে প্রত্যহ আফিস করে। বরফ একটি কুলির মাথায় দিয়া একেবারে প্লাটফরমে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। কুলি মোটের ভাড়া চারি আনা চাহে!

দু একটা কথান্তর হইতেই কুলি ইতরভাষায় গালাগালি করিতে করিতে বরফের থলিয়া গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিল। সম্মুখ দিয়া একজন কাল সাহেব যাইতেছিলেন, কুলি তাঁহাকে কি বলিল।

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"যাও, মাল ওজন করণে হোগা"। কাতরভাবে সৌমেন্দ্র বলিল,—"সাহেব পনের সের বরফ আছে। তুমি দয়া ক'রে হাতে ক'রে তুলে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে"। কাল সাহেবের মুখে এক বুলি—"নেই নেই, ওজন কর্‌ণে হোগা।"

ঠিক সেই সময় অদূরে ব্রেক্‌ভ্যানের নিকট ব্রেকে তুলিবার মালের মধ্য হইতে একটি পল্লিগ্রামবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার নিজের জীর্ণ ট্রাঙ্কটি খুলিয়া আফিমের কৌটাটি বাহির করিয়া লইতেছিল। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণের মৌতাতের সময় হইয়াছিল। এমন সময় একজন টিকিট্‌ কলেক্টর দ্রুত আসিয়া তাঁহার

পশ্চাদ্দেশে সবুট লাথি মারিলেন। বৃদ্ধ টাল সামলাইতে না পারিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। অনেক কষ্টে উঠিয়া বলিতে লাগিল,—"সাহেব, মার কেন? আমি আমার আফি-মের কৌটা বার ক'রে নিচ্ছি।"

হুহুঙ্কার শব্দে টিকিট্‌কলেক্টর বলিলেন—"শূয়ার, কেন তুমি বুক করা বাক্স হইতে জিনিষ বাহির করিয়াছ, তোমাকে পুলিশে দিব।" বলিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। বৃদ্ধ ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অমনি টং টং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার বেল হইল। গার্ড-সাহেব নিশান নাড়িয়া বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। হুইস্‌ল্‌ দিয়া হুস্ হুস্ শব্দে গাড়ী প্লাটফরম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সৌমেন্দ্র হতাশভাবে গাড়ীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

মিথ্যাগোলমালে সৌমেন্দ্রের ট্রেণটি ছাড়িয়া গেল। মধ্যে আর ট্রেণ নাই। বিশ্রামস্থলে বসিয়া সে আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল। পদনিম্নে থলিয়ার বরফ গলিয়া গড়াইয়া যাইতেছিল।

পাঁচটার সময়ে ট্রেণ, অনেকগুলি ডেলি প্যাসেঞ্জার তাহাতে যায়। সৌমেন্দ্র ট্রেণে গিয়া উঠিয়া বসিল।

অনেকগুলি "ডেলি প্যাসেঞ্জার" সেই কামরায় উঠিয়াছিল। যদিও তাহাদের বয়সের তারতম্য অনেক অধিক, তথাপি

তাহারা সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধবের মত হাস্যকৌতুক করিতে করিতে যাইতেছিল।

নানাবিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল, ষ্টেট্-সেক্রেটারী হইতে কলিকাতার ফেরিওয়ালাটি পর্য্যন্ত কেহই বাদ পড়িল না, ক্রমশঃ সমাজতত্ত্ব উঠিল। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল।

একপার্শ্বে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি বলিলেন—"শক্তিহীন শুধু ব্রাহ্মণ নন, একটা গল্প বলি শোন :—

কোন দেশে একজন খুব দানশীল রাজা ছিলেন, কেহই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হইত না। একদিন এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বাক্যযন্ত্রণায় রাজার নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনায় চলিলেন। পথে একটি ছোট খাল, প্রায়ই তাহাতে জল থাকে না, লোকে হাটিয়াই পার হয়, ব্রাহ্মণের পায় হইতে হাঁটুর কাপড় ভিজিয়া গেল।

রাজা তখন উদ্যান পরিদর্শন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অর্থই যাচ্ঞা, তখনকার রাজারা তাহা জানিতেন। রাজা প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের সিক্তবস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"এই আর সেই"।

ব্রাহ্মণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিলেন। রাজা বলিলেন,—"আপনি কল্য সভায় আসিবেন, আপনার সম্মান রক্ষা করিব।" ব্রাহ্মণ রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিল।

ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হইল"। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"কল্য রাজসভায় যাইতে বলিয়াছেন, কিন্তু আমি যাইব না।" ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"কেন ?"

ব্রাহ্মণ। যদিও আমি ভিক্ষার্থী দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপেক্ষার পাত্র নহি।

ব্রাহ্মণী। রাজা কি বলিয়াছেন ?

ব্রাহ্মণ। রাজা আমার বস্ত্রনিম্নাংশ সিক্ত দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"এই আর সেই"। আমি এই কথা ও হাসির মর্ম্ম কিছুই বুঝিলাম না।

ব্রাহ্মণী। তুমি বুঝিতে পার নাই, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি। রাজার কথার উত্তর আমি তোমাকে বলিয়া দিব।

পরদিন ব্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ রাজসভায় গেলেন। রাজা উঠিয়া অভিবাদন করিয়া দান দিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমি আপনাকে যাহা বলি তাহা অগ্রে করুন, নতুবা দান গ্রহণ করিব না।

রাজা উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"কি করিতে হইবে আদেশ করুন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"একটি জলপাত্রে কিঞ্চিৎ জল আনয়ন করুন।"

তৎক্ষণাৎ জল আনীত হইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এই শিলাখণ্ড পাত্রস্থিত জলে ফেলিয়া দিন।" ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র একখণ্ড শিলা রাজার হস্তে দিলেন। রাজা শিলাখণ্ড পাত্রে দিবামাত্র তাহা জলে ডুবিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"সেই আর এই।"

রাজা উপযুক্ত উত্তর পাইয়া লজ্জিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"মহারাজ! এখন আর রাজার হস্তেও শিলা ভাসে না, ব্রাহ্মণের গণ্ডূষেও সাগর শুকায় না, সকলই কালমাহাত্ম্য।"

এইরূপ নানাপ্রকার গল্পগুজব চলিতে লাগিল। সৌমেন্দ্রের তাহাতে লক্ষ্য ছিল না। সে একমনে তাহার পত্নী যোগমায়ার কথা ভাবিতেছিল।

সৌমেন্দ্র ট্রেণ হইতে নামিয়া গ্রামের পথ ধরিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। বাঁশবাগানের গাঢ় অন্ধকারমধ্যে দূরস্থিত দুই একটি গৃহের সান্ধ্য দীপের ক্ষীণ আভা কচিৎ দৃষ্ট হইতেছিল।

সৌমেন্দ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে ভয় হইতে লাগিল। বাড়ীর বাহিরে অন্ধকার, কোন আলো নাই, কেমন একটা

গভীর নিস্তব্ধতা, তাহার বুকের ভিতর হুহু করিয়া উঠিল, পা কাঁপিতেছিল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখে তাহার পিতা বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া আছেন, মুখ তুলিয়া সৌমেন্দ্রকে দেখিয়া কোন কথা বলিলেন না। সৌমেন্দ্র বাড়ীর ভিতরে গেল, সেখানেও সন্ধ্যার দীপ জ্বলে নাই। সে "মা মা করিয়া ডাকিল," কেহ উত্তর দিল না।

দাওয়ার উপর বরফ রাখিয়া সৌমেন্দ্র বাহিরে ফিরিয়া আসিল। একটা দারুণ আশঙ্কায় তাহার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মুখ ফুটিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

যদি তাই হয় :—ভগবন্! কি অসহ্য যন্ত্রণা ; সৌমেন্দ্র আর ভাবিতে পারিল না, বাহিরের দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। পল্লি নিস্তব্ধ, ঘরের পিছনের বনে মশকদল সমস্বরে চীৎকার করিতেছিল। সৌমেন্দ্র আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল।

রাত্রি হইল, কেহ ডাকিতে আসিল না, বেশী রাত্রে সৌমেন্দ্র নিজেই বাড়ীর ভিতর শুইতে গেল। দেখিল, তাহার ঘরের কতকগুলি বিছানা একপাশে জড় করা। মিট্ মিট্ করিয়া ঘরের কোণে একটা আলো জ্বলিতেছিল, সেটাও বড় নিস্প্রভ। কেমন একটা বিষাদের ছায়া গৃহটিকে যেন ঘিরিয়া আছে।

সৌমেন্দ্রের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। মাথায় দুই হাত দিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল। এমন সময়ে মাতা বাহিরে কাঁদিয়া উঠিলেন। সৌমেন্দ্রের একটা গভীর নিশ্বাসের সহিত যেন সমস্ত হৃদয় শূন্য হইয়া গেল। সে চৌকীর উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

প্রাতঃকাল, দেবদারু গাছের মাথার উপরে রক্তবর্ণ অরুণ রেখা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। শিশিরবিন্দু মুক্তার মত দুর্ব্বাঘাসের উপর সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সৌমেন্দ্র দাওয়ায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল।

পিতা স্নান করিতে ডাকিলেন। সৌমেন্দ্র কলের পুতুলের মত স্নান করিয়া আহারস্থানে গিয়া বসিল। মাতা বধূর গুণের ব্যাখ্যান করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সৌমেন্দ্র নীরবে আহার করিতে লাগিল। চোকে এক ফোঁটাও জল নাই।

দুপুর বেলা সৌমেন্দ্র শয়নগৃহে গেল। তেমনই চুলের দড়ি, সিঁদুরের কৌটা ব্রাকেটের উপর সাজান রহিয়াছে। দুই তিন দিন পূর্ব্বে যে পুষ্পের মালা আদর করিয়া মায়াকে পরাইয়া দিয়াছিল, তখনও শুষ্ক মালা ছবির ফ্রেমের উপর ঝুলিতে-ছিল। হায়! যাহার মালা সে আজ কোথায়! মাথার কাঁটা দিয়া যোগমায়া একদিন সৌমেন্দ্রের নাম লিখিয়া তাহার নীচে "তোমার চিরদাসী যোগমায়া" আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া

দেওয়ালে লিখিয়াছিল। কতদিনের লেখা যেন কাল লিখিয়াছিল বলিয়া ভ্রম হয়, সৌমেন্দ্র পলকহীন নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

চতুর্দ্দিকে পত্নীর স্মৃতি ছড়ান, সৌমেন্দ্র যে দিকে চোক্ ফিরায় সেই দিকেই যোগমায়ার স্মৃতি। হায়! যাহার স্মৃতি সে আজ কোথায়! যোগমায়া নাই, ভাবিতে সৌমেন্দ্রের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, সম্মুখের দেওয়ালে যোগমায়ার একখানি বড় ফটোগ্রাফ্ টাঙ্গান ছিল। যোগমায়ার পিতা ছবিখানি জামাতাকে দিয়াছিলেন। সৌমেন্দ্র সযত্নে বাঁধাইয়া ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। সৌমেন্দ্রের মনে হইল, সজীবের মত ছবি যেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সমস্ত দিন স্তব্ধভাবে সৌমেন্দ্র ঘরের ভিতর বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া মাতা গৃহে আসিলেন, সৌমেন্দ্র তখনও বসিয়া আছে। সস্নেহে মাতা বলিলেন—"বাছা, ভেবে আর কি কর্‌বে, মিছে দেহ নষ্ট। ভাব্‌লে ত আর ফির্‌বে না।" "আহা, কি লক্ষ্মী বউ—ই ছিল" বলিয়া অঞ্চলাগ্রে অশ্রুবারি নিবারণ করিলেন।

গভীর রাত্রে বাহিরে শৃগাল কুকুরের ঝগড়ায় সৌমেন্দ্র শয্যায় উঠিয়া বসিল। আলো ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল, সৌমেন্দ্র উজ্জ্বল করিয়া দিল। চাহিয়া দেখিল, যোগমায়ার ছবিখানি

তেমনি তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। দৃষ্টি উজ্জ্বল স্বচ্ছ প্রেম-পরিপূর্ণ। কিছুক্ষণ পরে ছবিখানি যেন অল্প অল্প দুলিতে লাগিল। ক্রমশঃই যেন ছবিখানি বড় হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহা জীবিত আকার ধারণ করিয়া স্বর্ণোজ্জ্বল ফ্রেমের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এ কি! জীবিত যোগমায়া! বিস্মিত সৌমেন্দ্র গত ঘটনা ভুলিয়া গেল। সৌমেন্দ্র আকুল কণ্ঠে ডাকিল—"মায়া!" তাহার পর সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিল প্রাতঃকাল হইয়া গিয়াছে।

সৌমেন্দ্র সমস্ত দিন, রাত্রির ঘটনা লইয়া চিন্তা করিতে লাগিল; স্বপ্ন কি সত্য, ভাল কিছু বুঝিতে পারিল না। বার বার সাগ্রহে ছবিখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। যতই সে ছবি দেখে, ততই তাহার মনে হয় রাত্রের ঘটনা মিথ্যা নয়। তাহার মায়া তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? মায়া ছাড়িয়া সে যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, ইহা তাহার ধারণায় আসিল না। তবে সে বাঁচিয়া আছে কেন? নিশ্চয়ই তাহার মায়া অন্তরীক্ষে আশে, পাশে, অলক্ষ্যে কোথাও আছে, কিন্তু কোথায় সে, তাহা জানে না, তাই তাহাকে পাইবার জন্য সৌমেন্দ্র ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, সৌমেন্দ্র তখনও তেমনি ভাবে

ছবির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। সংসারের কোন চিন্তা তাহার নাই, দিবারাত্র তাহার মাথার ভিতর যোগমায়ারই চিন্তা, সে চিন্তার সীমা নাই, শেষ নাই। সৌমেন্দ্র দেখিল, যোগমায়ার প্রতিমূর্ত্তি খানি যেন ঈষৎ দুলিতেছে, সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, চক্ষের ভ্রম নয়, যোগমায়ার আলেখ্যখানি সত্য সত্যই সজীব আকার ধারণ করিয়া ফ্রেমের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল।

আবার একি! যেন যোগমায়া ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিতেছে—সেই মায়া, সেই সব! তেমনই আলুলায়িত কেশরাশি, তেমনই কৃষ্ণ চক্ষু, তেমনই লাবণ্যময়ী রমণীয়কান্তি, তেমনই প্রতিপদক্ষেপের তালে তালে মলের মৃদু মন্দ শব্দ, তেমনই সুরভি নিশ্বাস। সৌমেন্দ্রের মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল। চক্ষের সম্মুখ হইতে সমস্ত আলো যেন সরিয়া গেল। তাহার পর তাহার আর কোন সংজ্ঞা রহিল না।

সৌমেন্দ্র কাহারও কথা শোনে না, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে না, দিবারাত্রি ছবিখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। সমস্ত দিন গেল, রাত্রি আসিল, সৌমেন্দ্র ছবিখানির প্রতি চাহিয়াই বসিয়া আছে। গভীররাত্রে যোগমায়ার আলেখ্যখানি আবার সজীব হইয়া তাহার নিকটে আসিতে লাগিল। যোগমায়ার নিশ্বাস সে স্পষ্ট অনুভব করিল।

ধীরে ধীরে মায়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।—কি শীতল স্পর্শ! সে আপনাকে ভুলিয়া গেল। ব্যাকুল ভাবে বলিল,—"মায়া, আমায় ছেড়ে কোথায় আছ?"

মায়া ধীরে ধীরে অতি কোমল কণ্ঠে বলিল,—"তোমায় ত আমি এক মুহূর্ত্তও ছেড়ে যাইনি।" সৌমেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল,—"তবে কেন লোকে বলে তুমি ম'রে গেছ।"

মায়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"মিছে কথা, আমি কি তোমায় ছেড়ে ম'র্ত্তে পারি।" মায়া প্রবল আগ্রহে দুই হাতে সৌমেন্দ্রের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। স্পর্শজনিত সুখ-আবেশে সৌমেন্দ্রের সমস্ত দেহ স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে দৃঢ়ভাবে মায়ার হাত ধরিয়া বলিল,—"বল আর ছেড়ে যাবে না"। মায়া দৃঢ়ভাবে বলিল,—"না"।

একটা পরম শান্তিসুখ আবেশে সৌমেন্দ্র ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পর দিন সকালে উঠিয়া সকলে দেখিল, সৌমেন্দ্রের প্রাণহীন দেহে শয্যার উপর পড়িয়া আছে, তাহার হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ।

অবরোধ

ইন্দুলেখা রূপসী, তেমন রূপ বিরল, হাতে, পায়ে, চোকে, মুখে যেখানে যেটী সাজে ভগবান্ তাহাকে দিয়াছেন। কিন্তু এত রূপ যার, তার নিজের রূপের গরব নাই। স্বভাবটী বড় মধুর, বড় সরল, বড় সুন্দর। প্রভাসচন্দ্র সৌভাগ্যবান্, তাই তিনি রূপে গুণে এমন মহিমময়ী পত্নী লাভ করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষে যথেষ্ট প্রণয়। চরিত্রবান্ প্রভাসচন্দ্র পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি যথেষ্ট, কোন অভাব নাই; হঠাৎ ঢাকা জেলার ফুলবাড়ী মৌজার প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; প্রভাসচন্দ্রের সেইখানে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এই-ই পতি-পত্নীর জীবনের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদ।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমস্ত রাত্রি ইন্দুলেখা স্বামীর বুক ভিজাইল। প্রভাসচন্দ্র পত্নীকে প্রবোধ দিবেন কি, নিজেরই চক্ষের জল থামে না। দুইজনের অশ্রুজলের মধ্যে পত্নীবৎসল প্রভাস-চন্দ্র ভোর বেলা পতিপ্রাণা ইন্দুলেখার মুখচুম্বন করিয়া বিদায় লইলেন।

ইন্দুলেখা খায় না, দায় না, দিবারাত্রি কাঁদে—জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া হাঁ করিয়া পথের পানে চাহিয়া থাকে। ঝি আহারের সময় ডাকিতে আসিলে সাড়া দেয় না। বাড়ীতে শাশুড়ী বা অন্য কোন বয়োবৃদ্ধা অভিভাবিকা নাই। ইন্দু-লেখা এই সতের আঠার বছরেই নিজের গৃহে নিজে গৃহিণী।

ইন্দুলেখার দু'বছরের একটী কন্যা, নাম লাবণ্যলেখা, মেয়েটীরও মায়ের মত রূপ। লাবণ্য গলা ধরিয়া মা বলিয়া ডাকে—বাহিরের দরজার দিকে চাহিয়া পিতার নিকট যাইবার জন্য মার অঞ্চল ধরিয়া টানে, ইন্দুলেখা আরও কাঁদিয়া আকুল হয়।

এইরূপে একমাস কাটিয়া গেল। একদিন প্রভাতে টেলি-গ্রাম আসিল, "এখানকার গোলোযোগ মিটিয়া গিয়াছে, কল্য কলিকাতায় পৌছিব।" এই সংবাদে বাড়ীতে সর-গোল পড়িয়া গেল। মালি গাড়ী বারান্দার পাম গাছ পিচ্‌কারী দিয়া ধুইতে সুরু করিল। বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া বেয়ারারা ঝাড় লণ্ঠন পরিষ্কার করিয়া ধোয়া চাঁদর ফরাস জুড়িয়া বিছা-ইতে লাগিল। সইস কচুয়ানেরা উর্দ্দী তক্‌মা সাফ করিয়া, গাড়ীর পিতল পালিশ আরম্ভ করিয়া দিল।

ইন্দুলেখারও আজ মুখে হাসি ধরে না, সে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইয়া বড় করিয়া একটী সিঁদুরের টিপ

পরিয়া কাপড় ছাড়িয়া জানালায় গিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই আসে এই আসে করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। গাড়ীর শব্দ হইলেই ইন্দুলেখা চমকিয়া ওঠে, আবার সে গাড়ী নয় দেখিয়া নিরাশে নিশ্বাস ফেলে।

এমন সময় একখানি গাড়ী ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। গাড়ীর ঝিলমিলি ফেলা, ভিতরে মিলন-উদ্বেগ-চিত্ত প্রভাসচন্দ্র ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

হর্ষে ইন্দুর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিল।

গাড়ী হইতে নামিয়াই প্রভাসচন্দ্র কন্যার মুখচুম্বন করিলেন, চাকর বেয়ারাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া উপরে উঠিয়া শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সম্মুখেই ইন্দু। মিলন-আকাঙ্ক্ষিতা ইন্দু মনে করিয়াছিল, একেবারে স্বামীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, কিন্তু সাক্ষাতে লজ্জায় তাহা পারিল না; চক্ষু নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই একমাস বিচ্ছেদেই কেমন একটা লজ্জা সঙ্কোচ তাহার অজ্ঞাতে তাহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রভাসচন্দ্র অগ্রসর হইয়া পত্নীর মুখচুম্বন করিলেন। হর্ষে ইন্দুলেখা পতির বুকে মাথা রাখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

(২)

এক দিন কোথায় নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য ইন্দু পায়ে আলতা দিয়া একখানি নীল কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দুই চারি দিন পূর্ব্বে চোক দিয়া জল পড়ায় চোকে একটু সরু করিয়া কাজল পরিয়াছিল। যে সুন্দর, তার সবই সুন্দর, প্রভাসচন্দ্র সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে হাসিয়া গান ধরিলেন—

"প্রিয়ে অঞ্জনে কেন রঞ্জেছ আঁখি
খঞ্জনে দিতে লাজ—
বুঝি অলক্ত রক্তিমপদে,
ভক্তে দলিবে আজ!
বদন নিন্দে পূর্ণ ইন্দু,
নিরখি ক্ষুব্ধ হৃদয়-সিন্ধু,
মণিসমজ্বলে সিন্দূরবিন্দু,
যেন, ফণীন্দ্রবেণীসাজ।
নীল নিচোলে ঢেকেছ অঙ্গ,
(যেন) নীল-সরোজলে নলিনী সঙ্গ,
(স্থির) নবঘন-দামে দামিনী রঙ্গ,
প' 'ল' অনঙ্গ শিরে বাজ!
কনক বরণে মণি আভরণ
অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে!

রত্নকিরণ উছলিছে ঝরি
বিকচ পুষ্পকুঞ্জে—
কবিমনোমধুকর গুঞ্জে—
রূপমঞ্জুল বন মাঝ ॥"

সাদরে প্রভাসচন্দ্র পত্নীর হাত ধরিয়া টানিয়া কক্ষবিলম্বিত দর্পণের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন—একবার নিজের মুখ-খানি দেখ দেখি, কাজল প'রে কেমন মানিয়েছে—চকিতে একবার আয়নার প্রতি চাহিয়াই ইন্দু রাঙা ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া বলিল—"যাও।"

এই চকিত চাহনিতেই ইন্দুলেখা আজ নিজের যে কি রূপ দেখিল, এতরূপ যে তাহার আছে সে তাহা পূর্ব্বে জানিত না, মুহূর্ত্তে কেমন একটা গর্ব্ব অনুভব করিল। অনেকবার সে আয়নায় মুখ দেখিয়াছে, কিন্তু কৈ এমন ভাবত মনে কখনও উদয় হয় নাই, একটা অজানিত গর্ব্বে তাহার ক্ষুদ্র বুকখানি ভরিয়া উঠিল।

প্রভাসচন্দ্র অগ্রসর হইলেন, ইন্দু সরিয়া গিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কেন সে এমন করিল, নিজেই তাল বুঝিতে পারিল না। প্রভাসচন্দ্র বলিলেন—"কি হ'য়েছে, আমার ওপর রাগ হ'লো নাকি?" ইন্দু কোন কথা বলিল না, কক্ষান্তরে চলিয়া গেল, আজ তাহার চলিবার ভঙ্গিতেও কেমন একটা নূতন ভাবমিশ্রিত।

প্রভাসচন্দ্র কারণ কিছুই বুঝিলেন না, ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেলেন। ইন্দুলেখা নিমন্ত্রণে গেল, কিন্তু মনের একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। নিমন্ত্রণবাড়ী হইতে ফিরিতে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল।

ইন্দুলেখা সমস্ত পথ আশা করিয়া আসিয়াছিল, আজ আমার স্বামী আমার জন্য না জানি কত উদ্‌গ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার স্বামী নিদ্রিত। ইন্দুলেখা হৃদয়ে একটা আঘাত অনুভব করিল, কতদিন প্রভাসচন্দ্র নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, ইন্দুর সারারাত নিদ্রা হয় নাই। সে বসিয়া বসিয়া স্বামী না আসা পর্য্যন্ত হয় উলের কাজ করিয়া নয়ত বই পড়িয়া কাটাইয়াছে, আজ তাহার স্বামী তাহার জন্য একরাত্রি, একটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না? ইন্দুর কেমন একটা দুঃখ হইল, অভিমানও হইল, সে সশব্দে অলঙ্কার খুলিতে লাগিল।

অলঙ্কারের শব্দে প্রভাসচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রভাসচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি গো, কেমন নেমন্তন্ন খেলে?" ইন্দু কিছু না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি প্রভাসচন্দ্র কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু ইন্দুর দারুণ মান কিছুতেই ভাঙ্গিল না। তাহার মনে হইতেছিল, আমি যতটা ভালবাসি, আমার স্বামী

আমাকে ততটা ভাল বাসেন না; একথা যত মনে হইতে লাগিল, ততই তাহার স্বামীর আনুপূর্ব্বিক ব্যবহারগুলির মধ্যে প্রণয়ের পূর্ণতার অভাব এবং মনে মনে নিজের প্রেমের গুরুত্বে একটা গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল।

এই উপেক্ষা ও অভিমানে ইন্দুলেখা তিন চারি দিন স্বামীর সহিত ভাল করিয়া কথা বলিল না। প্রভাসচন্দ্র যদি ইন্দুর সহিত কথা কহিতে আসেন, ইন্দু ইচ্ছা করিয়া ধরা দেয় না। ইন্দুলেখার মনে একটা গর্ব্ব ছিল যে তাহার স্বামী তাহাকে যতটুকু ভালবাসেন, সে তাহার স্বামীকে তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। উপেক্ষার ক্ষুদ্র আঘাতে ইন্দুলেখার হৃদয়ের এই লুক্কায়িত ভাবটী একদিনে মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিল।

প্রভাসচন্দ্রের একটু রাগ হইল। ভালবাসার লোকের উপরই অভিমান হয়, রাগ হয়, দুঃখ হয়। প্রভাসচন্দ্রও একটু গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

অনেক সময় দেখা যায়, মানুষের হৃদয় মধ্যে তাহার চিত্ত-বৃত্তির অনুকূলে এমন স্বাভাবিক ঘটনা-পরম্পরা আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহাদের প্রবল আকর্ষণে তাহাকে সেই দিকেই চালিত করিতে বাধ্য করে তাহারই ফলাফলকে আমরা ভবিতব্য বলি। ইন্দুলেখার এখানেও তাহাই ঘটিল।

(৩)

প্রভাসচন্দ্রের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়কন্যা হঠাৎ বিধবা হইয়া এই সময় তাহাদের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। অভাগিনীর পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে কেহই ছিল না। পরদুঃখকাতর প্রভাসচন্দ্র সাদরে অনাথাকে সংসারে আশ্রয় দিলেন।

মনে অশান্তি, কিছুই ভাললাগে না, প্রভাসচন্দ্র কখন কখন অবসরমত বিধবার দুঃখকাহিনী শুনিতেন, নানারূপে বিধবাকে সান্ত্বনা ও সদুপদেশ দিতেন।

এই সহানুভূতিই ইন্দুলেখার চক্ষে নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। প্রথম প্রথম দুই চারি দিন বিশেষ কিছু মনে হইল না বটে, কিন্তু তথাপি তাহার স্বামী তাহার সহিত কথা না কহেন কোথাকার কে আর একজনের সহিত দিবারাত্রি কথা কহিল, ইন্দু মনে কেমন একটা আঘাত অনুভব করিতে লাগিল। তাহার অভিমান আরও বাড়িতে লাগিল।

কিছুদিনের মধ্যেই ইন্দুলেখার মনে তাহার স্বামী সম্বন্ধে আর একটা বিরুদ্ধভাবের উদয় হইল। সে যত তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল, ততই তাহার ভাবের অনুকূলে স্বামীর সমস্ত ব্যবহারগুলি দেখিতে পাইল। মানুষের স্বভাবই এই যাহা বেশী ভাবা যায় মনের সেই ভাবগুলিই প্রবল হইয়া উঠে,

বিরুদ্ধ ভাবগুলি ক্রমশঃ মলিন হইয়া পড়ে। একটা দিক্ দেখিতে পায় আর একটা দিক্ একেবারে অন্ধকারে থাকে।

হতভাগিনী বিধবা কুক্ষণে এই পতি-পত্নীর দ্বন্দ্বের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া ইন্দুলেখার দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িতা হইতে লাগিল।

প্রভাসচন্দ্র পত্নীর এই ব্যবহারে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। অভাগিনী বিধবাকে তিনি আরও অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন।

হিতে বিপরীত হইল—ইন্দুলেখা তাহার স্বামীর উপেক্ষা আরও অধিকতর লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং স্বামীর চরিত্রের উপর সন্দিহান হইল।

বিধবা পতি-পত্নীর দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া স্বামীস্ত্রীতে মিল হইতে দিতেছে না, তাহার স্বামীকে পর করিয়া দিতেছে, যতই ইন্দুলেখা এ কথা আলোচনা করিতে লাগিল ততই সে বিধবাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর অধিক অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল।

দিন দিন ইন্দুলেখা কেমন হইয়া পড়িতে লাগিল। আর হাসি নাই, কোন কার্য্যে উৎসাহ নাই, খাইতে হয় খায়, শুইতে হয় শোয়, দিন দিনই সে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। যে কন্যাকে সে কোল হইতে নামাইত না, এখন সেই কন্যা ক্ষুধায়

কাঁদে। এক একবার কোলে লইয়া স্তন্য দিতে বিরক্ত হয়। থালায় ভাত পড়িয়া থাকে, ঝিয়েরা কিছু বলিলে রাগিয়া উঠে, তাহারাও ভয়ে কিছু বলে না। যে ইন্দুলেখা সকলের সহিত কোমল ব্যবহার করিত, সেই ইন্দুলেখা এখন দিন দিন কেমন কঠোর হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার স্বামী তাহার পর হইয়া যাইতেছেন ইন্দু এ কথা যত ভাবে ততই তাহার মাথার ভিতর ঘুরিতে থাকে, সমস্ত বুক শূন্য হইয়া যায়, জগৎ অন্ধকার দেখে।

ইন্দুর নিজের উপর নিজের রাগ হইতে লাগিল। এ কাল অভিমান কেন আসিয়াছিল? মুহূর্ত্তের রূপগর্ব্বেই তাহার সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে, আয়নাই ত তাহার সর্ব্বনাশ করিল সে রাগ করিয়া একদিন হঠাৎ নিজ কক্ষবিলম্বিত দর্পণ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল। কিন্তু আয়না ভাঙ্গিলে কি হইবে, স্বামী ত তাহার আপনার হইল না।

(৪)

ইন্দু স্বামীর গত ভালবাসা দখলে আনিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া পড়িল, কিন্তু যে ব্যবহারে স্বামীর ভালবাসা পাওয়া যায়, সে ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিল। আত্মবিসর্জ্জনই প্রেম।

প্রিয়কে সুখী করিবার প্রতিনিয়ত চেষ্টাই প্রিয়প্রীতি লাভের একমাত্র উপায়। ইন্দুলেখা তাহা ভুলিয়া গেল!

ইন্দু কথায় কথায় স্বামীকে নানারূপে আত্মহত্যার ভয় দেখাইতে লাগিল, কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। স্বামীর দুর্ব্বলতা বুঝিয়া ইন্দুলেখা যতই বন্ধন শক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই বন্ধন আলগা হইয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দু স্বামীর এই দুর্ব্বলতায় মনে মনে একটা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। এখনও স্বামীকে হাতে আনিবার উপায় আছে, সে স্বামীর ব্যবহারে ইহা যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই তাহার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িতে লাগিল।

প্রভাসচন্দ্র এখন ইন্দুকে ভয় করেন, কথান্তর করিতে সাহসী হন না। দুর্ভাগিনী নারী বুঝিতে পারিল না, তাহার স্বামী এখন সরল ব্যবহারের পরিবর্ত্তে অন্তরে বাহিরে দুইরূপ ব্যবহার করিতেছেন এবং সেও তাহার স্বামীর অন্তর হইতে ক্রমে দূরে যাইয়া পড়িতেছে।

মনোভঙ্গই স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ, মনের অসুখে দেহের অযত্নে ইন্দুলেখা শীঘ্রই কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়া পড়িল। প্রভাসচন্দ্র বড়ই চিন্তিত হইলেন, ডাক্তার ডাকাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, পত্নীর পীড়ায় খুব যত্ন লইতে লাগিলেন, ইন্দুর মনে হইল, স্বামী এই সমস্ত সুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে করিতেছেন, সে অন্তরে

আরও একটা গুরুতর আঘাত অনুভব করিতে লাগিল। প্রেমহীন কর্ত্তব্য বড় কঠোর, (বিশেষ প্রিয় বস্তুর নিকট) সেরূপ কর্ত্তব্য কেহই বাঞ্ছা করে না। স্বামীর এই আদর যত্নে ইন্দু বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিল।

তখন মাঘ মাস, দারুণ শীত, ঠাণ্ডা, হিম না মানিয়া প্রভাসচন্দ্র পীড়িতা পত্নীর শয্যাপার্শ্বে সারারাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। একমাস ভুগিয়া ইন্দুলেখা ভাল হইল।

এই ঘটনার অল্প দিন পর হইতেই প্রভাসচন্দ্রের অল্প অল্প কাশী দেখা দিল। সামান্য কাশী খেয়ালে আনিলেন না। এই সামান্য কাশীই প্রবল আকার ধারণ করিল। কাশীর সঙ্গে ঘুষঘুষে জ্বর। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যক্ষ্মা।

অনেক চিকিৎসা হইল বটে, কিন্তু ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রভাসচন্দ্র শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন।

ইন্দুলেখা মান অভিমান ভুলিয়া কায়মনে পতির সেবা করিতে লাগিল, নিজের ত্রুটী এখন সে বেশ অনুভব করিয়াছে, কিন্তু বড় শেষে সে তাহার ভুল বুঝিয়াছিল, পতির মৃত্যুশয্যায় পতি পত্নীতে পুনর্ম্মিলন হইল।

একদিন প্রভাতে প্রভাসচন্দ্র কন্যা ও পত্নীর হাত দুখানি বুকের উপর রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

ইন্দুলেখা মরিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে এত চেষ্টা করিয়াও মরিতে পারিল না। মৃত্যুর অধিক শেল বুকে লইয়া অনুতপ্তা রমণী চিরবৈধব্য বেশ পরিধান করিল।

(৫)

অনুতপ্তা বিধবার বিষময় জীবন ধারণ করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িল, কেবল সে পিতৃহীনা কন্যার মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া রহিল। নিজের জীবনকে সে শতসহস্রবার ধিক্কার দিত, রমণীর বুদ্ধিকে ধিক্কার দিত। রাত্রে নিদ্রা হইত না, দিবা রাত্র তাহার স্বামীর মুখখানি মনে পড়িত। হায়! যে স্বামী তাহার দোষে প্রাণ দিলেন সে তাঁহার জন্য কি করিয়াছে? পতি-প্রীতিদায়িনী পত্নী না হইয়া সে পতিহন্ত্রী হইয়াছে! ছার রূপ, ছার যৌবন, যাহার গর্ব্বে সে মুহূর্ত্তে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল সে ইচ্ছা করিয়া সেইরূপ নষ্ট করিতে লাগিল। চুলে তেল মাখে না, অল্প দিনেই চুলে জটা বাঁধিল, অবশেষে সে মস্তক মুণ্ডন করিল। এক বেলা এক চালা খায়, এক কাপড় গায়ে শুকায়, ভুলিয়াও সে কখন দর্পণে প্রতিমূর্ত্তি দেখে না, এমনি ভাবে কন্যাটিকে বুকে করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

কন্যা লাবণ্যলেখা দ্বাদশ বৎসরে পড়িয়াছে, আর অনূঢ়া রাখা উচিত নয়, ইন্দুলেখা দেখিয়া শুনিয়া ভাল ঘরে ভাল বরে

কন্যা সম্প্রদান করিল। মানুষ গড়ে, ভগবান্ ভাঙ্গেন। দুইবৎসর কাটিল না, পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসরে একদিন শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিতা পতিহীনা বালিকা লাবণ্যলেখা মাতার বুকে ফিরিয়া আসিল।

অদৃষ্টবিড়ম্বিতা হতভাগিনী কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কাঁদিলেই সব দুঃখ যায় না। যদি কাঁদিলেই সংসারের সব দুঃখই দূর হইত, তাহা হইলে দুঃখীরা দিবারাত্রই কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুঃখের অবসান করিত।

লাবণ্যলেখা যুবতী, তাহাতে অপরূপ রূপসী। ইন্দুলেখা সর্ব্বদা আশঙ্কা সর্ব্বদা উদ্বেগ লইয়া অনিদ্রায় নিশি যাপন করিতে লাগিল। কন্যাকে দেখিলেই তাহার মনে হয়, একদিন মুহূর্ত্তে সে এই রূপগর্ব্বে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছিল। আয়নার ভিতর ক্ষণিক প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিহিত রূপগর্ব্ব স্ফীত হইয়া ভাল মন্দ বিবেচনার শক্তি অবরোধ করিয়া দিয়াছিল।

লাবণ্যলেখারও তেমনি অপরূপ রূপ, তাই মাতা যত কন্যাকে দেখে, ততই তাহার ভয় হয়। ইন্দুলেখা যত ভাবে, তত তাহার ভাবনা বাড়ে; ভাবিয়া কূল কিনারা পায় না।

পতির মৃত্যুতেই ইন্দুলেখার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর এই অভাবনীয় ঘটনা ও দুশ্চিন্তায় সে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল।

ইন্দুলেখা পূর্ব্বে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য কায়মনে প্রার্থনা করিত, কিন্তু এখন সে মরিতে চায় না, মরিতে তাহার ভয় হয়, বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠে। ইন্দুলেখা ভাবে—তাহার অভাবে এই অপরূপরূপ-লাবণ্যসম্পন্না বিধবা কন্যা লাবণ্যলেখা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে; সংসারের নানা প্রলোভন, তাহাতে সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন অবস্থায় সে কেমন করিয়া পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিবে।

ইন্দুলেখা ভাবিতে ভাবিতে অধীর হইয়া পড়ে। নিশীথে কাতরে করযোড়ে পতি-উদ্দেশ্যে কায়মনে প্রার্থনা করে—"হে প্রভু. হে স্বামী, হে নারীর প্রত্যক্ষ দেবতা, তোমার কন্যাকে তুমি রক্ষা কর, সে যেন পবিত্র হৃদয়ে বৈধব্যরক্ষা করিয়া তোমার পিতৃপুরুষের গৌরব রক্ষা করিতে পারে।" দুইচক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া যায়। একটু শান্তি আসে, আবেশে একটু তন্দ্রাও হয়। প্রভাত হইতে না হইতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, আবার সেই চিন্তা--ইন্দু সব ভুলিয়া সে কেবল কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। হায়! অভাগিনী ইন্দুলেখার দুর্ভাবনায় অতিকষ্টে দিন কাটিতে লাগিল।

বর্ষার প্রারম্ভেই ইন্দুলেখা অসুস্থ হইয়া পড়িল। নানারূপ চিকিৎসা হইল, কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে কবিরাজি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

একদিন প্রাতে কবিরাজ মহাশয় ধীরে ধীরে চক্ষুনত করিয়া বলিলেন,—"মা! পরমায়ু কেহ দিতে পারে না, আপনি ইষ্ট দেবতা স্মরণ করুন্, তিনিই আপনার এখন মহৌষধ।"

বাহিরে প্রবল বৃষ্টি হইতেছিল, ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ, স্তব্ধ। ভেকদল বাগানের পুষ্করিণীর তীরে উল্লাসে সমস্বরে আনন্দরোল তুলিয়াছিল। সম্মুখে আমগাছে কয়েকটা ছাতারে-পাখী দুই পায়ে লাফাইয়া লাফাইয়া ডালের উপর উঠিতেছিল। কার্ণিসে বসিয়া কয়েকটা কাক নীরবে বৃষ্টির জলে ভিজিতেছিল, তাহাদের ভিতর একটা দাঁড়কাক বিকট রবে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছিল, বাহিরের ঝড় জলের শব্দের মধ্যেও সেই বিকট স্বর ইন্দুলেখার কর্ণে প্রবেশ করিল, সে একবার শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। কবিরাজ মহাশয় সেই অবসরে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া ইন্দুলেখা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল—"লাবণ্য, মা! একবার এ ঘরে এস তো।" ধীরে ধীরে লাবণ্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দুইচক্ষু লাল হইয়া গিয়াছে, সে মাকে দেখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনী বালিকা এ সংসারে মা ভিন্ন জানে না, বাল্যে পিতৃহীনা হইয়াছিল, মাতারই যত্নে সে লালিত পালিত, সেই মা তাহার বাঁচিবে না, এ কথা সে ভাবিতে

পারে না, তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, জগৎ অন্ধকার দেখে।'

করুণ দৃষ্টিতে ইন্দুলেখা কন্যার মুখের দিকে চাহিল, সেই দৃষ্টিতে রুদ্ধ মাতৃস্নেহ উছলিয়া পড়িতেছিল। শীর্ণ হাত দুইখানি তুলিয়া কন্যাকে পার্শ্বে বসাইয়া পরম স্নেহে কন্যার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। লাবণ্যলেখা কাঁদিয়া আকুল, মাতারও চক্ষের জল থামে না, অনেকক্ষণ দুইজনে নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর ইন্দুলেখা সস্নেহে কন্যার চ'খের জল পুঁছিয়া দিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "ছি মা! কেঁদ না, মা কারও চিরকাল বাঁচে না। ভয় কি! ভগবান্ আছেন,তার উপর বিশ্বাস রেখো'তোমার কোন অমঙ্গল হবে না"।

লাবণ্যলেখা কাঁদিয়া বলিল—"মা! আমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে' থাক্‌বো? আমার যে আর কেউ নেই"। ইন্দুলেখা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, সত্যই তাহার কেউ নাই। ইন্দু-লেখারও সেই ভয়। সংসার ভয়ানক স্থান, তাহাতে যৌবন, অপরূপ রূপ, অগাধ বিষয়, সহায়হীনা অথচ স্বাধীনা, এরূপ অবস্থায় পদস্খলন অতি স্বাভাবিক। ইন্দুলেখারও বরাবরই সেই চিন্তা, সে এই মৃত্যুশয্যায় আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তখন বৃষ্টি থামিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল, লাবণ্য-লেখা ঘরের জানালা খুলিয়া দিতে উঠিল। মরি মরি চলিবার

কি ভঙ্গী! শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিতা সুন্দরী জ্যোৎস্নাস্নাত সেফালিকার মত ঢল ঢল করিতেছিল, প্রতিচরণপাতে গৃহের এক একটি অংশ হাস্যমুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। লাবণ্য জানালা খুলিয়া দিল। একটা মৌমাছি উড়িয়া আসিয়া বার বার তাহার রক্ত গণ্ডে পড়িতে লাগিল, লাবণ্য সুকোমল বাহু দুইখানি নাড়িয়া বার বার তাহাকে তাড়াইতে লাগিল, কিন্তু সে রূপ-মদিরান্ধ মক্ষিকা কিছুতেই মানা মানে না, সে বুঝি ভাবিয়াছিল, লাবণ্যের গণ্ড দুইটী প্রস্ফুটিত গোলাপ, তাই সে বার বার পাগল হইয়া তাহার উপর পড়িতে যাইতেছিল।

মাতা কন্যার এই অপূর্ব্ব রূপরাশি অনিমিষ লোচনে দেখিতেছিলেন। আবার তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। লাবণ্যলেখা মাতার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইন্দুলেখা সাদরে শীর্ণ হস্তে কন্যার হাত দুইটী ধরিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—'ছি মা! সংসারে অধীর হ'তে নেই, যদি তুমি আমার জন্য নিতান্ত কাতর হও, যে কোন একখানি দর্পণের সম্মুখে এক মনে আমার চিন্তা ক'রো, আমার ছায়ামূর্ত্তি দর্পণের মধ্যে দেখ্‌তে পাবে"।

বিস্মিত হইয়া লাবণ্য মাতার মুখের দিকে চাহিল। ইন্দুলেখা বলিল, "অবিশ্বাস ক'রো না, নিশ্চয় দেখ্‌তে পাবে, তুমি তো পড়েছো, একাগ্রচিত্তে মৃত আত্মাকে স্মরণ ক'ল্লে সেই আত্মার

সঙ্গে দর্শন ঘটে, একাগ্রচিত্তে আমাকে স্মরণ ক'ল্লে আমার ছায়াও দেখ্‌তে পাবে"।

লাবণ্য বলিল "মা! একি হয়"?

ইন্দুলেখা বলিল—"নিশ্চয় হয়, আমার মৃত্যুর পর পরীক্ষা ক'রো, আমি তোমার নিকট এই মৃত্যুকালে সত্যবদ্ধ হচ্ছি, নিশ্চয় তুমি আমার প্রতিমূর্ত্তি দর্পণমধ্যে দেখ্‌তে পাবে"।

ইন্দুলেখা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহাতে বিশ্বাসের ভাব বর্ত্তমান। মুহূর্ত্তে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; সে একটা গুরুতর দুশ্চিন্তা হইতে আপনাকে অনেকটা মুক্ত বোধ করিল।

সেই সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দুলেখার আত্মাও ইহলোকের সকল চিন্তা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া পরলোকের পরম শান্তি লাভ করিল।

(৬)

মাতার মৃত্যুর পর লাবণ্যলেখা মাতার আদর্শে কঠোর বৈধব্য আচার প্রতিপালন করিতে লাগিল। সে অবসর পাইলেই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাতার দর্শনের জন্য আকুল ভাবে অশ্রুবর্ষণ করিত। অশ্রুজলে কিছুক্ষণ পরে আর সে

কিছুই দেখিতে পাইত না, নিস্পন্দভাবে কতক্ষণ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত—সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিত না;

একদিন লাবণ্যলেখা দেখিল যেন দর্পণের মধ্যে তাহার মাতার ছায়া, তেমনই স্নেহ কোমল দৃষ্টি, তেমনই সব। সে চীৎকার করিয়া হর্ম্ম্যতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

ইহার পর হইতেই সে মাতার দর্শনের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। দিবারাত্রই মাতার জন্য কাঁদে, মা ভিন্ন তার এখন অন্য চিন্তা নাই, সে এখন প্রায়ই দর্পণের মধ্যে মাতার ছায়া দেখিতে পায়।

লাবণ্যলেখা দর্পণের নিকট গেলেই তাহার মাতার মৃত্যু-কালীন মুখখানি মনে পড়িত, মাতার প্রতিজ্ঞা মনে পড়িত, তাহার আর নিজের অপরূপ রূপ দেখিবার অবসর হইত না।

বুদ্ধিমতী বিধবা অনেক চিন্তায় মৃত্যুসময়ে "দর্পণে আমাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া" বিধবা কন্যার যৌবনের রূপ-গর্ব্ব-মূলক দম্ভের হীনবৃত্তি উন্মেষের পথ "অবরোধ" করিয়া গেল।

(সমাপ্ত)

"Manjari"–The book under review is a collection of short stories from the pen of Babu Surendra Narain Roy. In short stories we generally fail to find intricate interplay of thought and action. But they are, have received their full, natural and psychological development at the hands of the young writer. The book is well-bound and is priced at Re. 1 a copy. We hope that the young writer will receive public support and encouragement."

Amritabazar Patrika--12th August, 1912.

"In the book under review, the author has shown beyond doubt his capacity to touch the the main spring of a story by which he can bring life to the dead and inert creatures of fancy and make them breathe and move about like us mortals feeling and perceiving just as we do. This is the keynote of his success."

Telegraph—29th June. 1912.

পুস্তকপ্রাপ্তির ঠিকানা—
প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে,
অতুল লাইব্রেরী—৫৪।৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ও
ইসলামপুর, ঢাকা।